মহামানব বিদ্যাসাগর

বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি

মহামানব
বিদ্যাসাগর

মহামানব বিদ্যাসাগর

বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি

বড়চারা । সবং । পশ্চিম মেদিনীপুর

Mahamanav Vidyasagar
মহামানব বিদ্যাসাগর

প্রকাশকাল
১৪ ফেব্রুয়ারী,২০২২ (১লা ফাল্গুন ১৪২৮)

প্রকাশ স্থান
বড়চারা পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ
পূর্ণাবয়ব বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশ

প্রকাশক
বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি

গ্রন্থ-সম্পাদক
অজিত কুমার বেরা
সৌম্যব্রত বেরা

অক্ষর বিন্যাস
বাপন মান্না

মূল্য ঃ ১২০ টাকা

মুদ্রণে–**'হরফ'**
মিত্র কম্পাউণ্ড । মেদিনীপুর শহর
Mob. : 9775851389 Email : haraf.print@gmail.com

বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি

বড়চারা । সবং । পশ্চিম মেদিনীপুর

উপদেষ্টা সর্বশ্রী হিমাংশু শেখর দাস
শচীন্দ্র নাথ দাস
মনতোষ মণ্ডল

সভাপতি দিলীপ কুমার সেনাপতি

সহ সভাপতি পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ
সূর্যকান্ত হাতী

সম্পাদক লক্ষ্মণ চন্দ্র বেরা

সহ সম্পাদক শিবশংকর সিমলাই

কোষাধ্যক্ষ রমেন কুমার দাস

কার্যকরি কমিটি

অনুপম মাইতি
রামকৃষ্ণ হাঁসদা
অনন্ত কুমার শীট
কার্ত্তিক চন্দ্র বেরা
বলাই চন্দ্র ঘোড়াই
ভাগবত চন্দ্র কুইল্যা
শ্রীমন্ত প্রসাদ মহাপাত্র
কার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী
গুরুপদ গাতাইত
সত্যপ্রসাদ মহাপাত্র
বিবেকানন্দ জানা
কমল কুমার জানা
গৌরাঙ্গ সাহু
মাধব চন্দ্র গাঁতাইৎ
নির্মল মান্না
সূর্যকান্ত পাত্র
হরিপদ জানা
অমল কুমার জানা
মনীন্দ্র নাথ বেরা
গৌতম গাঁতাইৎ
সুশান্ত মণ্ডল
প্রলয় কুমার গাঁতাইৎ

বিনয় কুমার বেরা
শম্ভুনাথ গিরি
দূর্গাপদ বেরা
রামপদ কুইল্যা
পরেশ চন্দ্র রাউৎ
সুষেণ বেরা
দীপক কুমার সর্দার
উৎপল মান্না
জয়দেব ঘোড়াই
শক্তিপদ কুইল্যা
হরিপদ রাউৎ
মলয় সিমলাই
স্বপন বেরা
কালিপদ ঘোড়াই
সঞ্জয় ঘোড়াই
অশোক মাইতি
কৃষ্ণপ্রসাদ বেরা
নারায়ণ চন্দ্র কুইল্যা
পঞ্চানন মাজী
গোবর্দ্ধন রাউৎ
তন্ময় পাঞ্জা

পার্থ মুখার্জী
শংকর প্রসাদ মণ্ডল
লক্ষ্মীকান্ত গিরি
নিশিকান্ত রাউৎ
শ্যামপদ রাউৎ
দুলাল জানা
অজয় রাউৎ
প্রভাত মণ্ডল
তপন জানা
বিকাশ রায়
নারায়ণ হাতী
ভীম মাজী
জয়দেব পতি
খোকন মান্না
তপন জানা
রামপদ বেরা
নিতাই চন্দ্র গাঁতাইৎ
কেশব বেরা
স্বপন জানা
নিশিকান্ত মাজী
কালিপদ কুইল্যা

যাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে
মহামানব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন
অনুষ্ঠানটি সার্থক হল

উন্মোচক

শ্রদ্ধেয় ষড়ানন পণ্ডা

প্রাক্তন শিক্ষক, সভাপতি, সবং সায়েন্স সোসাইটি

প্রধান অতিথি

শ্রদ্ধেয় পরেশ বেরা

আঞ্চলিক ভাষার কবি ও বাচিক শিল্পী

বিশিষ্ট অতিথিবর্গ

শ্রদ্ধেয় দিলীপ আদক

অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সবং পশ্চিম চক্র

শ্রদ্ধেয় চৈতন্য চরণ দাস অধিকারী

প্রধান শিক্ষক, নারায়ণবাড় উচ্চ বিদ্যালয়

শ্রদ্ধেয় যুগল প্রধান

প্রধান শিক্ষক, দশগ্রাম এস. এস. শিক্ষাসদন

ভাস্কর স্বপন মাইতি

পূর্ণাবয়ব বিদ্যাসাগর মূর্তির শিল্পী

সম্পাদকের কলমে

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচক মহোদয়, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও সভায় উপস্থিত বিদ্যাসাগর অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ। ১৮২০-এর ২৬ শে সেপ্টেম্বর থেকে আজ ২০২২-এর ফেব্রুয়ারী'র ব্যবধান খুব একটা কম নয়। এর মধ্যে পৃথিবী দুশো বারের বেশি বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে। কালের স্রোত সতত ধাবমান, তার চলার পথে সে কত কিছুকেই না ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মুছে ফেলে কত সাম্রাজ্য, কত নগরী, কত জনপদ, আরও কত কিছু কে। ঝাপসা হয়ে যায় অনেক স্মৃতি, অনেক কীর্তি, তবুও সময় বোধহয় সবকিছু ভুলিয়ে দিতে পারে না। তা যদি পারত তাহলে দুশো বছর পরেও তিনি কীভাবে আমাদের স্মৃতিতে অমলিন থাকলেন? শৈশবে নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে গ্রামের পাঠশালায় পাঠ গ্রহণ। ১৮২৯ এ কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি এবং অসাধারণ মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করা তার ছাত্রজীবনের দুর্লভ অর্জন। ১৮৪১ এর সেপ্টেম্বরে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার হয়ে চাকরি জীবন শুরু। সাহেবদের বাংলা শেখানোর দায়িত্ব নিতে হলো তাঁকে। মাইনে মাসিক পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ বছর পর সহকারি সম্পাদকের পদে যোগদান, ১৮৪৭ এ পদত্যাগ, আবার ১৮৫১ তে ওই সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে ফেরা, অল্প কিছুদিনের মধ্যে 'Council of Education' এর সদস্য হয়ে গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর।

এবার শুরু হলো তার কর্মজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের। ছেলেমেয়েদের পড়াতে হবে, তাই বিদ্যালয় গড়ে তোলা। ছাত্র-ছাত্রী জোগাড় করা, শিক্ষক নিয়োগ, তাদের মাইনের ব্যবস্থা করা। স্কুল তো গড়া হলো কিন্তু পড়বে কী? তার জন্য বই লেখা, বই ছাপানোর জন্য প্রেস তৈরি করা। এ সবকিছুই সামলাতে হয়েছে তাঁকে। ছেলেদের সাথে মেয়েদের পৃথক স্কুল গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রায় সর্বস্ব পণ করে লেগেছিলেন। ১৮৫৭ এর নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ এর মে মাসের মধ্যে বিদ্যাসাগর ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় গড়েছিলেন। এর বেশিরভাগ বিদ্যালয় পরিচালনার খরচ তাকেই বহন করতে হতো। বিদ্যালয়ের পাঠদান হবে মাতৃভাষায় আর সেই সাথে ইংরেজি সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং গণিত,

ইতিহাস বিষয়গুলি ছিল বিদ্যালয় পাঠক্রমে।

শিক্ষার প্রসার ঘটানোর সাথে তিনি সমাজ সংস্কারের লড়াইয়েও কোমর বেঁধে লাগলেন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো কু-প্রথা গুলি কিছুটা দূর হলো। তবে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো বিধবা বিবাহ প্রচলন। তাঁরই লড়াইয়ের ফলে ইংরেজ সরকার ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ করতে বাধ্য হল। নারী জাতির প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

পৃথিবীর দেশে দেশে নানান সময়ে নানান মনীষী জন্মেছেন এ কথা সত্য এবং আগামীতেও জন্মাবেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো মনীষী বোধহয় দুটি হয় না। তিনি একক, তিনি অনন্য। তিনি শুধু বাংলা বা বাঙালি নয়, তিনি সমগ্র মানবজাতির। তিনি এক যুগপুরুষ তিনি যতটাই বর্তমানের ঠিক ততটাই ভবিষ্যতের। তাঁর সমাজ কল্যাণকর কর্মময় জীবনের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। যুগে যুগে তাঁর গুণাবলী মানব জাতির উপর প্লাবন বয়ে আনুক, এই আশা রাখি।

এবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় উন্মোচক, প্রধান অতিথি, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ ও গুণীজনদের যাঁরা মহামানব বিদ্যাসাগরের উপর গভীর আবেগপূর্ণ লেখা দিয়ে আমাদের স্মারক-গ্রন্থ'টি সমৃদ্ধ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা পরিবারের প্রয়াতদের স্মৃতিতে নামের ফলক দান করেছেন, অর্থ দিয়ে, সুপরামর্শ দিয়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকেই। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব এই মূর্তিটির ভাস্কর মাননীয় স্বপন মাইতি মহাশয়কে, যিনি মূর্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয় প্রতিটি মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে আমাদের সুপরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং আগামী দিনেও আমাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে আমাদের মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছেন। অবশেষে বলি, মূর্তি স্থাপনের এই কর্মপ্রক্রিয়ায় বুঝলাম, মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি কী আবেগ লুকিয়ে আছে। তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহ এলাকাবাসীর সুনিপুন কর্মদ্যোগে মূর্তিটি সুরক্ষিত রেখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণাবলী চর্চার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে এই প্রয়াস পূর্ণতা লাভ করুক। এই আশা রেখে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম।

শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র বেরা, প্রাক্তন শিক্ষক
সম্পাদক
বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি

গ্রন্থ-সম্পাদকের কলমে

বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি'র প্রচেষ্টায় ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানের স্মরণিকা হিসেবে "মহামানব বিদ্যাসাগর" গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মময় জীবনের সাগর-সমান ব্যাপ্তি এবং তা থেকে বিচ্ছুরিত তাঁর যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-মনস্ক, সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকা আধুনিক মনন ও চেতনা-জগত'কে এই দুই মলাটের মধ্যে গ্রন্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মহামানব বিদ্যাসাগর'র চিন্তা-চেতনা'র ধারক-বাহক হিসেবে সংকলন গ্রন্থ'টি সংগ্রহযোগ্য হয়ে উঠবে, এই আশা রাখি।

Office of the
SABANG PANCHAYAT SAMITI
Phone : 03222- 249232/249343
Fax No. :03222-249700
SABANG ★ PASCHIM MEDINIPUR ★ WEST BENGAL ★ PIN - 721144

Ref No. ____________ Date ____________

শুভেচ্ছা বার্তা

বর্তমান অতিমারীর এই বিপর্যস্ত সময়ে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলা করতে করতেও বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতির উদ্যোগে মহামানব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্তি স্থাপন ও সেইসঙ্গে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনার এই মহান প্রয়াসকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাই, বর্তমান সময়ে মহামানব ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাসঙ্গিকতা এবং তাঁর আদর্শ আমাদের সমাজ তথা ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরও সমৃদ্ধ করুক এই কামনা করি।

বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতির এই প্রয়াসকে সবং পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে সাফল্য কামনা করি, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত জনগনকে পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই,

SABANG PANCHAYAT SAMITY
Sabang, Paschim Medinipur

সভাপতি
সবং পঞ্চায়েত সমিতি,
সবং, পশ্চিম মেদিনীপুর,

Sabhapati,
Sabang Pancnayet Samiti
Paschim Medinipur

GOVT OF WEST BENGAL

EDUCATION DEPARTMENT

OFFICE OF THE SUB-INSPECTOR OF SCHOOLS

Sabang West Circle

Vill- Dantarda ❋ P.O.- Chandkuri ❋ P. S.- Sabang ❋ Dist- Paschim Medinipur
e-mail: clrc.sabangwest@gmail.com

Dilip Adak,
WBSub.ES

Date : 24th January,2022

।। শুভেচ্ছা বার্তা ।।

সবং পশ্চিম চক্রের অন্তর্গত বড়চারা পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি'র উদ্দ্যোগে মহামানব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন এবং তৎসহ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী,২০২২ এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদি'র কথা অনুসারে *" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোটো, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, যে তাঁহার নাম গ্রহন আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।"* এই রূপ মহামানবের পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন ও মহামানব কে নিয়ে সারাদিন চর্চা অবশ্যই আমাদেরকে তাহাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে সাহায্য করবে এটা আমার বিশ্বাস।

আমি এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং বড়চারা বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি'র সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

(দিলীপ আদক)
অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক
সবং পশ্চিম চক্র
পশ্চিম মেদিনীপুর

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

বিদ্যাসাগর চরিত-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।১৫
আধুনিকতম মানুষ বিদ্যাসাগর-সুকুমার সেন ।২০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ।২৪
বিদ্যাসাগর-মাণিক মুখোপাধ্যায় ।২৯
কবিতা-মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।৩৬-৩৭
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ।৩৮-৪১
গান-মান্না দে, শুক্লা কাউরী ।৪২-৪৩

দ্বিতীয় পর্ব

কবিতা-চিরন্তনী জানা, দীপ দাস অধিকারী ।৪৬
লক্ষ্মী রাণী দাস, তপন কুমার দাস ।৪৭-৪৮
মহামায়া রায়, হরিপদ জানা ।৪৯-৫০
কালীশংকর গাঙ্গুলী, সুপর্ণা, সুহৃদ বিলাস দাস ।৫১-৫৩
শেখ্ আকবর ।৫৪
গান-ভূষণ চন্দ্র মণ্ডল ।৫৫
প্রবন্ধ-দেবাশিস আইচ ।৫৬
পরেশ বেরা ।৬৩
শৈবাল ঘোষ ।৬৫
দেবাশীষ মান্না ।৬৮
চৈতন্য চরণ দাস অধিকারী ।৭২
যুগল প্রধান ।৭৪
উত্তম প্রধান ।৭৭
দিলীপ কুমার সেনাপতি ।৮০
পার্থ সারথী দাস ।৮২

তৃতীয় পর্ব

নাটক ঃ চেনা অচেনা ঈশ্বর-ভূষণ চন্দ্র মণ্ডল ।৮৮
বিদ্যাসাগরের উইলের নকল ।১১০
বিদ্যাসাগরের রচনাপঞ্জী ।১১৫
বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ।১১৮

১ম পর্ব

এই পর্বে
সংকলিত হয়েছে
বিদ্যাসাগরকে
নিয়ে লেখা
অন্যান্য
মনীষীদের
প্রবন্ধ, কবিতা,
গান ইত্যাদি।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মাতা ভগবতী দেবী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পত্নী দীনময়ী দেবী

বিদ্যাসাগর স্মৃতিভবন। বীরসিংহ

https://online.fliphtml5.com/liaae/sbga/#p=70 15/122

বিদ্যাসাগর চরিত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণ সভা বছর বছর হয়, কিন্তু তাতে বক্তারা মন খুলে সব কথা বলেন না এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান, অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন।

এর থেকে একটি কথাই প্রমাণ হয় যে, তাঁর দেশের লোক যে যুগে বদ্ধ হয়ে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ সেই বড়ো যুগে তাঁর জন্ম, যার মধ্যে আধুনিক কালেরও স্থান আছে, যা ভাবী কালকে প্রত্যাখ্যান করে না। (যে গঙ্গা মরে গেছে তার মধ্যে স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা আছে, বহমান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি আধুনিক। বহমান কাল-গঙ্গার সঙ্গেই বিদ্যাসাগরে জীবনধারার মিল ছিল, এই জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।)

বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। যেখানে তাঁর বুদ্ধির ঔদার্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যা কিছু পাশ্চাত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেননি। তিনি জানতেন বিদ্যার মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের দিকবিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অথচ তিনি বর্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন।

এই বিদ্যা সম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যার বাইরের ব্যবহার ও বেশভূষা প্রাচীন কিন্তু তাঁর অন্তর চির নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন সেইটেই বড়ো রমণীয় হয়েছিল। তিনি অনেক বেশি বয়সে বিদেশী বিদ্যায় প্রবেশলাভ করেন এবং তাঁর গৃহে বাল্যকালে ও পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত বিদ্যারই চর্চা হয়েছে। অথচ তিনি কোনো বিরুদ্ধ মনোভাব না নিয়ে অতি প্রসন্নচিত্তে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সবচেয়ে পূজনীয়। কারণ তিনি আমাদের দেশে বলবার পথ প্রস্তুত করে গেছেন। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষদের কাজই হচ্ছে এইভাবে বাধা অপসারিত করে ভাবী যুগে যাত্রা করবার পথকে মুক্ত করে দেওয়া। তাঁরা মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের সত্য সম্বন্ধের বাধা মোচন করতে জানেন। বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যানই তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হয়ে থাকবে। এই ব্রাহ্মণতনয় যদি তাঁর

মানসিক শক্তি নিয়ে কেবলমাত্র দেশের মনোরঞ্জন করতেন তাহলে অনায়াসে আজ তিনি অবতারের পদ পেয়ে বসতেন এবং যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁকে সহ্য করতে হত না। কিন্তু যাঁরা বড়ো, জনসাধারণের চাটুবৃত্তি করিবার জন্য সংসারে তাঁদের জন্ম নয়। এইজন্যে জনসাধারণও সকল সময় স্তুতিবাক্যের মজুরি দিয়ে তাঁদের বিদায় করে না। যে জাতি মনে করে বসে আছে যে, অতীতের ভান্ডারের মধ্যেই তার সকল ঐশ্বর্য, সেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করবার জন্য তার স্বকীয় উদ্ভাবনের কোনো অপেক্ষা নেই, তা পূর্বযুগের ঋষিদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়ে চিরকালের মতো সংস্কৃত ভাষায় পুঁথির শ্লোকে সঞ্চিত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবনতি হয়েছে, শক্তির অধঃপতন হয়েছে। নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে কখনোই সে আরাম পেত না। কারণ, বুদ্ধি ও শক্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদ্যমকে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে যা অজ্ঞাত, অলব্ধ, তার অভিমুখে নিয়ত চলতে চায়; বহুমূল্য পাথর দিয়ে তৈরি কবরস্থানের প্রতি তার অনুরাগ নেই। যে জাতি অতীতের মধ্যেই তার গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজয়যাত্রা স্তব্ধ হয়ে গেছে; সে জাতি শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শক্তিহীন ও নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব তাহাদের অপমানের দ্বারাই সেই জাতির মহাপুরুষদের মহৎ সাধনার যথার্থ প্রমাণ হয়।

আজকাল আমরা দেশে প্রাচ্যবিদ্যার যে সম্মান করছি তা কতকটা দেশাভিমানবশতঃ। কিন্তু সত্যের প্রতি নিষ্ঠা বশতঃ প্রাচীন বিদ্যাকে সর্বমানবের সম্পদ করবার জন্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ব্রতী হয়েছিলেন আমাদের বাংলার রামমোহন রায় এবং তার জন্য অনেকবার তাঁর প্রাণশঙ্কা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে। আজ আমরা তাঁর সাধনার ফল ভোগ করছি। কিন্তু তাঁকে অবজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হই নি। তবু আজ আমরা তাঁকে নমস্কার করি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ, আচারের যে হৃদয়হীন প্রাণহীন পাথর দেশের চিত্তকে পিষে মেরেছে, রক্তপাত করেছে, নারীকে পীড়া দিয়েছে, সেই পাথরকে দেবতা বলে মানেন নি, তাকে আঘাত করেছেন। অনেকে বলবেন যে, তিনি শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু শাস্ত্র উপলক্ষ মাত্র ছিল, তিনি অন্যায়ের বেদনায় যে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে তো শাস্ত্রবচনের প্রভাবে নয়। তিনি তাঁর করুণার ঔদার্যে মানুষকে মানুষরূপে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাকে কেবল শাস্ত্রবচনের ধারক রূপে দেখেন নি। তিনি কত কালের পুঞ্জীভূত লোকপীড়ার সম্মুখীন হয়ে নিষ্ঠুর আচারকে দয়ার দ্বারা আঘাত করেছিলেন। তিনি কেবল শাস্ত্রর দ্বারা শাস্ত্রের খন্ডন করেন নি, হৃদয়ের দ্বারা সত্যকে প্রচার করে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালি জীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া - হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে - করুণায় অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার একনিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয়

যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে - তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগর জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্য তাঁহারই কৃতকীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।...

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন, ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে, জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সু পরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনের সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহাও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। .... তিনিই ইংরাজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে

স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপন করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না; তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভুরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য বীর্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজেদের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে।

... আশা আছে যে, এমন একদিন আসবে যেদিন আমরাও সম্মুখের পথে চলতে গৌরব বোধ করব, ভূতগ্রস্ত হয়ে শাস্ত্রানুশাসনের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পিছনে পড়ে থাকব না, যেদিন 'যুদ্ধং দেহি' বলে প্রচলিত বিশ্বাসকে পরীক্ষা করে নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই জ্যোতির্ময় ভবিষ্যৎকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে যাঁরা প্রত্যুষেই জাগ্রত হয়েছিলেন তাঁদের বলব, 'ধন্য তোমরা, তোমাদের তপস্যা ব্যর্থ হয় নি; তোমরা একদিন সত্যের

সংগ্রামে নির্ভয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলে বলেই আমাদের অগোচরে পাষাণের প্রাচীরে ছিদ্র দেখা দিয়েছে। তোমরা একদিন স্বদেশবাসীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলে, মনে হয়েছিল বুঝি তোমাদের জীবন নিষ্ফল হয়েছে, কিন্তু জানি সেই ব্যর্থতার অন্তরালে তোমাদের কীর্তি অক্ষয়রূপ ধারণ করেছিল।'

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদ্যাসাগরচরিত' (বিশ্বভারতী ১৯৭২) পুস্তিকায় প্রাপ্ত চারটি প্রবন্ধের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি থেকে বর্তমান রচনাটি সংকলিত। প্রথম প্রবন্ধটি সাধু ভাষায় এবং তৃতীয়টি চলিত ভাষায় লিখিত। সংকলনকালে ভাষা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে এবং পুস্তিকার নাম অনুসারেই এখানে প্রবন্ধের নামকরণ করা হয়েছে।)

> আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত যাহা উচিৎ বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

আধুনিকতম মানুষ বিদ্যাসাগর

সুকুমার সেন

বিদ্যাসাগর অ-সাধারণ মানুষ ছিলেন, একদম up-to-date তাঁর মতন 'আধুনিক' মানুষ আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে জন্মায় নি। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আমাদের মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দিয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত up-to-date বলতে আড়াইজন মানুষের নাম করতে পারি। একজন বিদ্যাসাগর; অন্যজন রবীন্দ্রনাথ; আর অর্ধেক হলেন রাজা রামমোহন রায়। বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রগণ্য। এমন কি, তার স্থান রবীন্দ্রনাথেরও উপরে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, বিশ্বকে তিনি এক করে দেখতেন, তবু তিনিও পুরোপুরি সংস্কারমুক্ত ছিলেন না। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার, ধর্ম ও সামাজিক মুক্তিভাবনা - এই দুইকে তিনি সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখতে পারেন নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর সবদিক থেকেই সংস্কারমুক্ত ছিলেন।

প্রতিটি মানুষ আপন পরিবারের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পারিবারিক আচার-আচরণ যে আপনা থেকেই অনুগমন করতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক এবং উচিত।... অবশ্য যিনি স্বাধীনচেতা মানুষ তিনি এই পারিবারিক প্রভাবকে স্বীকার করেও অতিক্রম করে যান। এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে ফুটে ওঠে যা অন্যের চরিত্রে সচরাচর দেখা যায় না। বিদ্যাসাগর ছিলেন এমনি এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। অদ্ভুত চরিত্র এই অর্থে যে কারুর সঙ্গে তার মিল নেই।..একটা স্বাধীনভাব ও অকুতোভয়তার সঙ্গে পরের জন্যে গভীর সহানুভূতি ও বেদনা অনুভব তাঁর চরিত্রকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের অনমনীয় ভাব অবশ্য তাঁর পিতৃপিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেন। তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ স্পষ্টবক্তা ও স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন।...

সেইসঙ্গে বিদ্যাসাগর চরিত্রে প্রভূত পরিমাণে নিজস্বতাও দেখা যায়। তিনি পৈতে রাখতেন, কিন্তু পুজো-আচ্চা বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন না। বামুনের বেশ ধুতি-চাদর পরতেন কিন্তু চেয়ার-টেবিলে বসে লেখাপড়া করতেন। যুক্তিহীন প্রথাগত নিয়মকানুনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা ছিল তার স্বভাব বিরূদ্ধ। সমাজের উচ্চবর্ণ লোকের সঙ্গে তিনি মিশতেন, কিন্তু সে মেলামেশায় প্রাণের টান অপেক্ষা কর্তব্যের তাগিদটাই বেশি ছিল। তার উচ্চবর্ণের যে-কজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, তারা হয় তার সহপাঠী অথবা সমভাবুক। কিন্তু নিম্নবর্ণের লোকের সঙ্গে তিনি

খুব সহজভাবে মিশতেন। সে মেলামেশায় একটা আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল, একটা খোলামেলা ভাব ছিল। তিনি যেমন তাদের কাছে টেনে নিতেন, তারাও তাকে একেবারে কাছের মানুষ ভাবতে পারত।...বিদ্যাসাগর নানাধরণের সংস্কার কাজে হাত দিয়েছিলেন, তবে তিনি সব থেকে বেশি সফল হন শিক্ষাবিস্তারে, বিশেষ নারীশিক্ষা বিস্তারে। নারীর উন্নতি স্বাভাবিকভাবে যাতে ঘটে সেজন্যে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করে গেছেন এবং বেশ কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। অন্যপক্ষে বিধবাবিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজদের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও কতটাই বা কৃতকার্য হতে পেরেছিলেন? বহুবিবাহ রদের আন্দোলনও তো বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। অবশ্য এদেশে শিক্ষাবিস্তারে তাকে কম পরিশ্রমও করতে হয় নি। তিনি সরকারের উপর পুরো নির্ভর না করে একের পর এক স্কুল খুলে গেছেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন, নারীশিক্ষার যাতে উন্নতি হয়, যাতে তাদের শিক্ষায় আগ্রহ বাড়ে সেইজন্য স্কুলের মেয়েদের নিজের হাতে বই উপহার দিয়েছেন।...

বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কারমূলক কাজ শুধু শহরের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। এ ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। তার সব সংস্কার কাজের ক্ষেত্রই ছিল শহর গ্রাম সর্বত্র জুড়ে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বাবু ও সাধারণ ভেদাভেদ মেনে কাজ করা তাঁর সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। আসলে শহর সম্পর্কে বর্তমান কালের ধারণা নিয়ে তাঁর কাজের বিচার করতে গেলে নানারকম ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছনরই সম্ভাবনা থাকে। শহরের গণ্ডির মধ্যে যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি তার বড় প্রমাণ হল - শেষ বয়সে শহরবাসী শিক্ষিতদের সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার পর তিনি শহর ছেড়ে পাড়াগাঁতে গিয়েই বসবাস করতেন। কার্মাটারে সাঁওতালদের মধ্যে থাকার সময়েও তিনি নানাকাজে যুক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর কখনও অলসভাবে দিন কাটাননি।

তখনকার একটা ঘটনা থেকে তাঁর পরোপকারবৃত্তি ও সদাশয়তার কথা জানা যায়। ঘটনাটা আমি বাবার মুখে শুনেছি। তখন বিদ্যাসাগর কর্মাটারে রয়েছেন। একদিন বেশি রাত্তিরে কতকগুলি বাঙালী তীর্থযাত্রী তীর্থ সেরে ফেরার পথে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করল। তিনি তাদের বসানোর ব্যবস্থা করে জিজ্ঞেস করলেন, "তা তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?" তারা বলল, 'না, আমাদের খাওয়া হয় নি। তবে এত রাত্তিরে আর আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না, ভাত না খেলেও আমাদের অসুবিধা হবে না।'

এত রাত্তিরে এখনো খাওয়া হয় নি ? তা তোমাদের বক্কাল আছে তো?" বক্কাল? সে আবার কি? (বক্কাল তরকারি বা চাটনি) বলি খিদে আছে তো?

বিদ্যাসাগর তাদের মুখের ভাবে বুঝলেন তারা খিদেয় কাতর হলেও তাঁর

কষ্টের কথা ভেবে না খেয়ে রাত কাটিয়ে দিতে চাইছে। তিনি সেই নিশুতি রাতে তাদের আলুভাতে ভাত রান্না করে খাইয়ে দিলেন। মানুষের উপকার করার সময় বিদ্যাসাগর এতটুকু কষ্ট বা ক্লান্তি অনুভব করতেন না; উপকৃত ব্যক্তির জাতবিচার করাও ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরূদ্ধ। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকেই ইউটিলিটারিয়ান ফিলজফির দ্বারা প্রভাবিত হন। তাদের অনেকে আবার রাজনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কাজের সঙ্গে রাজনীতির কোন যোগ ছিল না। তা থাকার অবশ্য কোন সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, বিদ্যাসাগর সংস্কারমূলক কাজে যখন যুক্ত ছিলেন সে সময় আমাদের দেশ রাজনীতি করার stage-এ পৌঁছায়নি। রাজনীতি এল অনেক পরে, যখন দলগত স্বার্থচিন্তা দেখা দিল। আমাদের শিক্ষিত লোকেদের মনে রাজনীতি করার প্রবৃত্তি জাগে দলগত স্বার্থচিন্তা থেকেই।

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব মানুষের জীবনের স্বাধীনতা। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি আনুকূল্য দেখাবার কথা তিনি ভাবতে পারেন নি। এই ভেদাভেদ বোধ ছিল না বলে সেকালের অনেক প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ গড়ে উঠেনি। হিন্দুমেলা ছিল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান, মুসলমানদের সঙ্গে নেওয়ার কথা এই প্রতিষ্ঠানের কর্তারা ভাবেন নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর তো মুসলমানদের ত্যাগ করেন নি। তাই হিন্দুমেলার সঙ্গে তার বিশেষ যোগ ছিল না, তবে তিনি যে মেট্রোপলিটন কলেজে মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করেন নি, তার বাস্তব কারণ ছিল। মুসলমানদের কলেজে নিলে হিন্দু ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে চলে যেত। খ্রীষ্টানদের নিয়েছিলেন। খ্রীষ্টান অধ্যাপকও ছিল, যেমন জ্ঞানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। মানুষকে মানুষ হিসেবেই তিনি দেখতেন, তাকে সম্প্রদায় বিশেষে বিভক্ত করে কদাপি নয়। এই স্বভাবের বলে তিনি কাওয়েল সাহেরেরও অনেক উপকার করেছেন।

Indian Association বা 'ভারত সভা' র সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের যোগ ছিল না। ভারতসভা ছিল শিক্ষিত ভারতীয়দের সভা যাদের ব্রিটিশ সরকারের বিরূদ্ধে নানা অভিযোগ-অনুযোগ ছিল। বিদ্যাসাগর কোন কোন ইংরেজ রাজকর্মচারীর আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা তাদের জন্যে ব্যহত হয়, তাঁকে সরকারী চাকুরিও ছাড়তে হয় তাঁর প্রতি সরকারের অবিচারের প্রতিবাদে। তবে প্রতিবাদে চাকুরি ত্যাগ করার পরেও দল বেঁধে সরকারের কাছে অভিযোগ জানাবার প্রবৃত্তি তাঁর হয় নি। আসলে সরকার তো চেয়েইছিল তিনি চাকুরি করুন, আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগায় ও অভিমানে তিনিই চাকরি ছাড়েন। Institution বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু করা, সবাইকে নিয়ে

একসঙ্গে চলার মানসিকতা বিদ্যাসাগরের ছিল না একথাও ঠিক নয়। মেট্রোপলিটন কলেজ তো তিনিই গড়েছিলেন, তবে তিনি চাইতেন প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনের । মতো করে গড়ে তুলতে। প্রতিষ্ঠান চালাবার ব্যাপারে অন্যের অকারণ হস্তক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। তখন সেই প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেই সরে দাঁড়াতেন।...

সরকারী চাকরি ছাড়ার পর বিদ্যাসাগর স্বাধীন ব্যবসায় নেমেছিলেন। কারও দ্বারা প্রভাবিত বা প্ররোচিত হয়ে অথবা কোন ব্যবসায়িক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি এ-কাজে নামেন নি। জীবিকা অর্জনের তাগিদ তো ছিলই; তা ছাড়া শিক্ষার প্রসার ঘটানো, কম দামে ভাল বই পাওয়ার ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের বই উপহার দিয়ে তাদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা, এইসব উদ্দেশ্য মাথায় রেখে তিনি গ্রন্থ রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের কাজে হাত দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত উপার্জনের চেয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যই তাকে ব্যবসায়ে নামতে উৎসাহিত করেছে বেশি পরিমাণে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন Pragmatist-বাস্তবধর্মী। নিজের অভিজ্ঞতায় মানুষের উপকারের জন্যে যা করণীয় বিবেচনা করেছেন, আপন স্বভাব মতো সেকাজেই অগ্রসর হয়েছেন। অপরের যোগ্যতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন;অন্যপক্ষে ছলচাতুরিকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে তিনি সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত ছিলেন। তার মতন up-to-date মানুষ আজ পর্যন্ত কোথাও জন্মেছে কিনা সন্দেহ। একটাই সংস্কার ছিল তার - তা হচ্ছে দেশের প্রতি টান। এই স্বদেশপ্রীতির আকর্ষণে এ-দেশের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার তিনি মেনে চলতেন। এরই টানে ধুতি-চাদর তাঁর প্রিয় পরিধেয় হয়ে উঠেছিল। পায়ে থাকত তালতলার চটি, যা 'বিদ্যাসাগরী চটি' নামেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন না।... প্যারিস থেকে বই বাঁধিয়ে আনতে তাঁর সংস্কারে বাধত না। সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাকে তিনি আবশ্যিক করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর চলার পথ নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি কাউকে অনুসরণও করেন নি, কারু দ্বারা প্রভাবিতও হন নি। অন্যেরা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে সমাজসংস্কারে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু বিদ্যাসাগর আপন অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েই সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যখন ইংরেজদের সান্নিধ্যে আসেন অথবা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কার্যরত অবস্থায় ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন, তার পূর্বেই তার মানসগঠন সম্পূর্ণ হয়েছিল। সকলের থেকে স্বাতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠা এই মানুষটির চরিত্রের প্রধান দুটি গুণ-স্বাতন্ত্রবোধ ও স্বাধীনচিত্ততা।...

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পলাশির লড়াইয়ের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর চরিত্র ইতিহাসে যে স্থান লাভ করিয়া আসিয়াছে, বিদ্যাসাগরের চরিত্র তাহা অপেক্ষা এত উচ্চে অবস্থিত যে, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতেই অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হইতে হয়। বাগ্‌যত কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে এত ব্যবধান যে, স্বজাতীয় পরিচয়ে তাহার গুণকীর্ত্তণ দ্বারা প্রকারান্তরে আত্মগৌরব খ্যাপন করিতে গেলে, বোধ হয়, আমাদের পাপের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।...

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবা মাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুস্পর্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

...এই দেশের এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র

পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা, এই দুদ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে, তাহাদের মধ্যেই পাওয়া যায়; আমাদের মত যাহারা তুলির দুধ চুমুক দিয়া পান করে ও সেই দুধে মাখন তুলিয়া জল মিশাইয়া লয়, তাহাদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

সেই জন্যই বিদ্যাসাগরকে আমাদের বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্য জাতিসুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন।

পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়দের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্রগঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু পিতৃপিতামহ হইতে তাহার ধাতুতে ও মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভিন্ন করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে; জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টকসমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপ সেই কাঁটাগুলাকে ছাটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;তাহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যে স্থানে যাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সে স্থানে তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্যন্ত একবারেই প্রবেশলাভ করে নাই। পরজীবনে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্যের স্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র

তাহার পূর্ব্বেই সমভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল; আর নতুন মশলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। যে বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সহিত আমরা এত পরিচিত, যে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পরের ক্ষেতে যবের শীষ খাইতে গিয়া গলায় কাঁটা ফুটাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অথবা আহারকালে পার্শ্ববর্তীদের ঘৃণার উদ্রেক ভয়ে নিজের পাকস্থলীতে আরশুলার ন্যায় বিকট জন্তু প্রেরণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই বালক বিদ্যাসাগরেই সেই চরিত্রের প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়।... তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনই বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজত্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরত্ব গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই; এমন কি, তাঁহার এই নিজত্ব সময়ে এমন উগ্র মূর্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্ব্বক এই পরত্বকে সম্মুখ দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণ স্বীকার করিতে হয় নাই।

সম্প্রতি আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন মাননীয় কোন মহাশয় এইরূপ একটা কথা তুলিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্যগণের সহিত আমাদের সামাজিক কুটুম্বিতা স্থাপন না ঘটিলে আমাদের জাতীয় চরিত্রের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কথাটা লইয়া আমাদের সমাজ মধ্যে অনেকটা আন্দোলন চলিয়াছিল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পাশ্চাত্য বেশভূষার ও পাশ্চাত্য আচারের পক্ষপাতী, তাহারা এই আন্দোলনে কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

বৈদেশিকের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন ও বিদেশের আচার-গ্রহণ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ করিতে গেলে কি ফল ঘটিত, বোধ হয়, উল্লেখ অনাবশ্যক। তাহার খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ হইতেই তাহার উত্তর মিলিতে পারে। চটিজুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটিজুতাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

...বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকেই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতিকার করিতে হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব সর্বদা তাহা স্বীকার করিতে

চাহে। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবা মাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাবমোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুল-শীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়, তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে, কি অপকার হইবে ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতিতত্ত্ব-ঘটিত ও সমাজতত্ত্ব-ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাহার ব্যক্তিত্ব একবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন; পরের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত। এই লক্ষণের দ্বারা তাঁহার মানবপ্রীতি অন্য দেশের মানবপ্রীতি হইতে স্বতন্ত্র ছিল। ...কঠোরতার সহিত কোমলতার সমাবেশ ব্যতীত মনুষ্য-চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। ভারতবর্ষীয় মহাকবির কল্পনায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব বজ্রের ন্যায় কঠোর ও কুসুমের ন্যায় কোমল; যুগপৎ ভীম ও কান্ত, অধৃষ্য এবং অভিগম্য।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর সীতার বনবাস রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদন প্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল। কোন বালিকা বিধবার মলিন দর্শন মাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষস্থলে গঙ্গা প্রবহমান; ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইবা মাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন। বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই ব্রজের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্য দেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্য-চরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষা তাচ্ছিল্য করিবেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন।...তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবাবিবাহের পথ-প্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম্ম।

বস্তুতই এই বিধবাবিবাহ ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটা দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন।... দুর্বল মনুষ্যের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্যবিহিত, সমাজবিহিত অত্যাচার তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝায় ভার চাপায়। ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বাল্যবিধবার দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণামন্দাকিনীর ধারা বহিল।... বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রুকুটীভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দন্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদন্ড নমিত করে।

> আমি টাকা অপেক্ষা, পদ-মর্যাদা অপেক্ষা সম্ভ্রমই অধিক মূল্যবান মনে করি। যে কাজে সম্ভ্রমের অপচয় হয়, আমি সে কাজ করিতে চাহি না।

বিদ্যাসাগর

মাণিক মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর শতাধিক বছর কেটে গিয়েছে। তবুও বিদ্যাসাগর চরিতচর্চার প্রাসঙ্গিকতা আজও প্রশ্নাতীত। শত শত আলোকবর্ষ দূরে দীপ্যমান জ্যোতিষ্ক যেমন ভাস্বর, তেমনি সুদীর্ঘকাল-ব্যবধান সত্ত্বেও ভাস্বর তার কর্ম জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলি। বিদ্যাসাগরের চিন্তা-ভাবনা, তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলন সমসাময়িককালে অনেকেই যে মেনে নেয়নি বরং বাধা দিয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, প্রথপ্রদর্শকদের সর্বযুগেই বিপুল বাধা অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে যে ধরণের তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা বোধ হয় তুলনাহীন। বিদ্যাসাগরের সুমহান ব্যক্তিত্ব, তাঁর চরিত্রের মহত্ব এবং সমাজজীবনে তার ভূমিকার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

বিদ্যাসাগরের অবির্ভাবের আগে ভারতবর্ষে রেনেশাঁ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। রামমোহনের আগেই এদেশে কারো কারো চিন্তায় ও কর্মে বিছিন্নভাবে রেনেশাঁসের ভাবধারা উকি-ঝুঁকি দিচ্ছিল। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বা এরকম কিছু কিছু মানুষকে আমরা দেখতে পাই যাঁরা কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানবতাবাদী মূল্যবাধ নিয়ে খানিকটা সমাজ সংস্কারের কথা বলেছিলেন। রামমোহন সেসব প্রয়াসকে সংযোজিত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। অর্থাৎ একটা সোস্যাল সিস্টেম অব থট (সামাজিক চিন্তাধারা) হিসাবে সেগুলো রামমোহনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। তাই রামমোহনকে বলা হয় ভারতীয় রেনেশাঁসের অগ্রদূত।

রামমোহন ধর্মসংস্কারের পথেই রেনেশাঁ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। রামমোহনের সংগ্রাম পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা সংকীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বেদান্ত দর্শনের চর্চা তিনি করেছেন এবং একজন বেদান্তবিদ হিসাবে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ধর্ম যাতে সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা না হয় সেজন্য চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় মূল্যবোধকে সমাজ এবং মানুষের বিকাশের স্বার্থে ঢেলে সাজানো,ধর্মীয় সংস্কার সাধন এই পথেই রামমোহন শুরু করেন। ধর্মীয় সংস্কারের মধ্য দিয়েই সংস্কারমুক্ত একটা ধর্ম, ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই যতদূর সম্ভব বিচারমূলক যুক্তিবাদ ও মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ আনার চেষ্টা করেছিলেন। এরই

ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মের মধ্যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান দিক আমরা দেখতে পাই। রামমোহন বেদান্তের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে, তার ভিত্তিতেই ধর্মসংস্কার করতে চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর এসে চিন্তাক্ষেত্রে এই জায়গায় ছেদ ঘটালেন। এইখানেই রেনেশাঁসের চিন্তার পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা গুণগত পরিবর্তন আনলেন বিদ্যাসাগর। তার চিন্তা ও কর্মজীবনের দার্শনিক ভিত্তি হল সেকুলার মানবতাবাদ।

বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন বিচার করলে দেখা যাবে, ১৮৫১ সালের ২২শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং তারপর থেকে সতের-আঠার বছর ধরে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বিধবাবিবাহ আন্দোলন, বহুবিবাহ রদ, তত্ত্ববোধিনী ও সোমপ্রকাশ পত্রিকার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা ও সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষকতা, গ্রন্থ রচনা প্রভৃতি বহুবিধ সামাজিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

বিদ্যাসাগর যখন শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন, তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকর্তা হিসবে লর্ড ডালহৌসি একদিকে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করছেন যা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামগ্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথকেই সুগম করেছিল অন্যদিকে তখনই তাদেরই স্বার্থে এদেশে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও ডাক চলাচলের মারফত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা তারা গড়ে তুলছে। বলা বাহুল্য শোষক-উৎপীড়ক দেশীয় রাজা-বাদশাদের জন্য বিদ্যাসাগরের বিশেষ মমতা ছিল না। কাজেই এদেশে কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তার এবং দেশীয় রাজন্যদের রাজত্ব হারানোর ঘটনায় তিনি বিচলিত হননি। তিনি বিশেষভাবে ভেবেছেন এদেশের তমসাচ্ছন্ন সামাজিক অবস্থার কথা, শিক্ষাপ্রসার ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে মানুষকে সামন্তী কূপমণ্ডুকতা ও অন্ধতা থেকে মুক্ত করার কথা। সেই কাজে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকর্তাদের কাছ থেকে কতখানি সহায়তা আদায় করা সম্ভব -এটাই তিনি ভেবেছেন। তিনি দেখেছেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের মধ্যে যাঁরা উদারনৈতিক, তাদের চিন্তাধারায় পাশ্চাত্য নবজাগরণের প্রভাব রয়েছে, তাঁদের সাহায্য নিলে সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের কাজ ত্বরান্বিত হবে, তাই অকুণ্ঠচিত্তে তিনি তাদের সাহায্য নিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর এদেশে একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা সম্পর্কে সেদিন তার যে উন্নত ধারণা ছিল তা আজও অনেকের মধ্যে নেই। বিদ্যাসাগরের মতো এত বড় শিক্ষাব্রতী আমাদের

দেশে আর জন্ম গ্রহণ করেননি। শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি যুক্তিবাদী মন, বৈজ্ঞানিক মনন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এক কথায়, শিক্ষার দ্বারা তিনি মানুষ গড়তে চেয়েছেন।

বিদ্যাসাগর শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরকারের কাছ থেকে নিয়েছেন, কিন্তু সরকারী অর্থ সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে চাননি। গরীব ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ রেখে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের কাছ থেকে মাসিক বেতন নেওয়া শুরু করেন। বিদেশী শাসনকর্তা বা উচ্চপদস্থ আমলারা অনেকেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টার অনুকূল ছিলেন না। তাছাড়া, ইংলণ্ডস্থ কোম্পানীর ডিরেক্টররা চাইছিলেন শিক্ষাখাতে খরচ কমাতে এবং জনশিক্ষার নামে অর্থহীন নামমাত্র শিক্ষা দিতে। আর বিদ্যাসাগর চাইছিলেন, শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ গড়তে এবং সরকারী হুকুমনামা অনুযায়ী না চলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকার বজায় রাখতে। এই দুই বিপরীত শিক্ষাদর্শের সংঘাত বাধল অচিরেই। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার নিয়ে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধ দেখা দিল। এই বিরোধের তাৎপর্য ধরতে না পেরে অনেকেই একে ব্যক্তিগত জেদের লড়াই বা দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাত ভেবেছেন। আসলে এ সংঘাত হল শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষার স্বাধিকারের ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী দুই দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাত। গর্ডন ইয়ং-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মত পার্থক্যের সূত্র ধরে পরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। তখন বিদ্যাসাগর নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে বেসরকারী প্রয়াসে সমস্ত নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সচল রেখেছিলেন। জনশিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষায়তন তৈরী করার জন্য তিনি ব্যাপকভাবে মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় একক চেষ্টায় কেন্দ্রীভূত শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থা যাকে বলে পাবলিক এডুকেশন সিস্টেমএদেশে বিদ্যাসাগরই তার গোড়াপত্তন করেন ও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে গেলে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। তাই মাতৃভাষাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য 'বর্ণপরিচয়' রচনা থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে বহু পাঠ্য বই তিনি রচনা করেছিলেন, নানা ভাষা থেকে অনুবাদ করে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছিলেন। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে উৎসাহ দিয়েছিলেন বাংলায় পাটিগণিত ও বীজগণিত রচনা করার জন্য। নিজে গণিতশাস্ত্রে বাংলা পরিভাষা সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বিদ্যাসাগরের বিরাট অবদান সম্পর্কে কারো দ্বিমত নেই।

বিদ্যাসাগর বলেছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী হলে তবেই তারা মাতৃভাষার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবে। সংস্কৃতের সঙ্গে

ইংরাজীর চর্চা না করলে বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটবে না। সংস্কৃত হল বাংলা ভাষার ভিত্তি। তাই সংস্কৃত শিখতে হবে। আবার সংস্কৃত ভাষার দ্বারা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ব করা যাবে না; সেজন্য ইংরাজী শিখতে হবে।

বিদ্যাসাগর যেভাবে শিক্ষার পাঠক্রম নির্ধারণ করেছেন এবং যে রীতিতে, যে ধরণের বিষয়বস্তু অবলম্বন করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন, তার মধ্যেও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য জীবনচরিত এবং চরিতাবলী তিনি রচনা করেছেন। দু'ধরণের চরিত্র তিনি বেছে নিয়েছেন। প্রথমতঃ কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ মহান বিজ্ঞানীর চরিত্র, যারা ধর্মীয় সনাতন ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে লড়েছেন আধুনিক যুক্তিবাদ ও পরীক্ষানিরীক্ষা ভিত্তিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ডুবাল, রস্কো প্রভৃতি চরিত্র, যাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান, সহায় সম্বল বলতে কিছু না থাকা সত্বেও যাঁরা কঠোর জীবন সংগ্রাম করে কেউ বড় দার্শনিক হয়েছেন, কেউ বড় শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক, মানবপ্রেমী হয়েছেন তাদের জীবনী তিনি লিখেছেন। দারিদ্রের জয়গান তিনি করেননি, কারণ সেটা তার নীতি নয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, কঠোর লড়াই করে তুমি যদি শিখতে চাও, তেমন অদম্য প্রয়াস তোমার যদি থাকে, তাহলে তোমাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। বলতে চেয়েছেন - অলৌকিক কোন শক্তির দ্বারা বা অদৃষ্টের দ্বারা মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারিত হয় না। আর্থিক সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লেও সংগ্রাম, প্রয়াস ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ বড় হতে পারে। বড় চরিত্র কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে। ফলে, শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের এই অনুপ্রেরণা আনতে হবে এবং প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো শক্তিমান তাদের করতে হবে। তাই দৃষ্টান্তমূলক চরিত্রগুলি কি করে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছে সেটাই তিনি দেখাতে চেয়েছেন। এগুলো তিনি শিক্ষার ক্যারিকুলামে আনার চেষ্টা করেছেন। পাঠ্য পুস্তকে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেই তিনি কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ, দয়া, কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি মানবিক গুণের শিক্ষা দিয়েছেন। একেবারে শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগে লিখেছেন, 'মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ, যে মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না। সকলে তাহাকে ঘৃণা করে। মিথ্যা বলা মহাপাপ, মিথ্যা বললে নরকে যায়।' এসব অতিপ্রচলিত কথা। কিন্তু বিদ্যাসাগর তা লেখেননি, এমনকি পশুদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বলতে গিয়েও সব জীবই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলেননি। সচেতনভাবেই তিনি এগুলো বলেননি। শিক্ষা থেকে ধর্মীয় প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছেন।

শিক্ষা আন্দোলন ছাড়াও বহু সামাজিক আন্দোলন বিদ্যাসাগর গড়ে তুলেছেন। যেমন- বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ রদ প্রভৃতির নিরিখেও তাকে বুঝতে হবে। এইসব সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে জীবন

সম্পর্কে যে ধারণা, যে উপলব্ধিগুলো তিনি এনেছেন, তা অসাধারণ। তিনি এমনও বলেছেন, স্বামী যদি লম্পট হয়, অযোগ্য হয় বা অন্য কারণেও ইচ্ছে করলে পতি ত্যাগ করার অধিকার মেয়েদের দেওয়া উচিত। বারবণিতার পুত্রের সম্ভ্রান্ত স্কুলে পড়বার অধিকার আছে কি নেই, এ নিয়ে ১৮৫৩ সালে যখন বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তখন বিদ্যাসাগর সুস্পষ্ট বলেছিলেন, 'মা দুশ্চরিত্রা হতে পারে, কিন্তু পুত্র কি দোষ করল যে সে বিদ্যালয়ে পড়তে পাবে না? মায়ের দোষে নিরপরাধ পুত্রের শাস্তি হওয়া উচিত নয়।' পতিতা নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "বিধবা নারী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হওয়ার পর পতিতা হলেও মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।" (রাধারমণ মিত্র : কলকাতায় বিদ্যাসাগর)

একজন বলিষ্ঠ মানবতাবাদীর মতোই নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তির একটা মহান উপলব্ধি থেকে তিনি বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ বা বাল্যবিবাহকে বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজের মানুষকে প্রভাবিত করতে তিনি শাস্ত্রের সমর্থন তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে অশ্রুসজল যুক্তি এবং আকূল মানবিক আবেদনের দ্বারা মধ্যযুগীয় সামন্তী সমাজের পাষাণ হৃদয়ে দাগ কাটার চেষ্টা করেছেন।

সমাজের ভিতর থেকে সামাজিক আন্দোলনের জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম করেছেন, আবার এমন কোন হঠকারিতা করেননি যাতে হিন্দু সমাজপতিরা বৃহত্তর সমাজ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। সমসাময়িককালে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ব্যর্থতা তিনি চোখের উপর দেখেছিলেন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধিরা ধর্মীয় এবং সামন্তী নিগড় ভেঙে ফেলা সত্ত্বেও উগ্রতার জন্য কিভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন তা বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন। তাই সমাজ আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। আবার ব্যক্তিগত জীবন ও আচার আচরণে ছিলেন আপসহীন। বিদ্যাসাগরের প্রশস্তিতে তাই মাইকেল বলেছিলেন - 'First man among us.'

কিন্তু আধুনিক হবার জন্য তাঁর মদ খাবার দরকার হয়নি। হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ভাঙ্গব বলে গরুর মাংস খাবার দরকার হয়নি। ইয়ং বেঙ্গল যেমন নিজেদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী তৈরী করেছিল বা পরে ব্রাহ্মরা যেমন নিজেদের মধ্যে একটা গোষ্ঠী তৈরী করতে চেয়েছিল, বিদ্যাসাগর তেমনভাবে চলেননি। বৃহত্তর সমাজের একজন হিসাবে ভিতর থেকে মোচড় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে দেখেছেন যে কিছু কিছু সংস্কার সেই মুহূর্তে সমাজকে গ্রহণ

করানো যাবে না। তাই সেগুলো করার চেষ্টা করেননি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্ঞানের পরিধি বিরাট শুধু নয়, সে যুগের অত্যাধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা তিনি করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, ভারতীয় দর্শন এবং হিন্দু শাস্ত্রে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, আবার পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শনও তিনি ভালো করে পড়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে কোরাণ পাওয়া গেছে। হিন্দুশাস্ত্রের পাশাপাশি কোরাণ তিনি অধ্যয়ণ করেছিলেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শন, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, এমনকি নিউটনের প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকার মতো কঠিন গণিত গ্রন্থও তার নিজস্ব সংগ্রহের মধ্যে ছিল। এ থেকেই বোঝা যায় সমসাময়িক কালের চিন্তার দিক থেকে তিনি কতখানি অগ্রণী ছিলেন। আর জ্ঞান জগতে যা তিনি অর্জন করেছেন, পড়েছেন এবং বুঝেছেন, সেই সত্যোপলব্ধিকে আপসহীনভাবে জীবনে প্রয়াগে করেছেন। বিদ্যাসাগরের চরিত্র, তার কর্মকাণ্ড, আচার আচরণ, সমাজ সংস্কার এগুলোর সাথে তার চিন্তা ও জীবনদর্শনকে মিলিয়ে দেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত জীবনে, প্রতিটি আচার আচরণে পুরোপুরি সেক্যুলার ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কোন ধর্মীয় আচার পালনের দিকে যাননি; পূজা অর্চনা করেননি, কোন ধর্মস্থান, তীর্থ, মন্দিরে যাননি। সেই যুগে এটা একটা দৃষ্টান্ত। রামকৃষ্ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আলাপ-আলোচনার কথা সকলেই জানেন। রামকৃষ্ণ অতবড় মানুষ, তিনি নিজে এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। কারণ রামকৃষ্ণ অপরের গুণের মূল্য বুঝতেন। চিন্তার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করা সত্বেও তার মূল্য বুঝতে পারাটা রামকৃষ্ণের মহত্বেরই পরিচায়ক। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও রামকৃষ্ণ সে যুগের বহু গুণী ও শিক্ষিত মানুষকে প্রভাবিত করেছিলেন। অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। মেট্রোপলিটান স্কুলের মাষ্টার মহেন্দ্র গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছিলেন। শ্রীমা রচিত রামকৃষ্ণ কথামৃত বইটিতে দেখা যায়, রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলছেন, 'একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান, ভারি চমৎকার জায়গা।' তিনি কিন্তু 'দক্ষিণেশ্বরের মন্দির দেখতে আসুন' বলে আমন্ত্রণ করেননি। বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও জীবনধারার প্রকৃতিটা বুঝেছিলেন বলেই রামকৃষ্ণ মন্দির দেখতে যাবার কথা বলেননি, বলেছিলেন, 'বাগান দেখতে যাবেন।' এই জায়গায় রামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। আমন্ত্রণের উত্তরে বিদ্যাসাগর সৌজন্যবশতঃ বললেন, 'যাব বৈকি, আপনি এলেন, আর আমি যাব না?' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যাননি। পরে রামকৃষ্ণ মহেন্দ্র মাষ্টারকে বলেছেন, বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? বিদ্যাসাগর সেদিন বললে এখানে আসবে, কিন্তু এল না? অবশ্য

বিদ্যাসাগর মিথ্যা বলেছেন, তা নয়। বাড়িতে এসে রামকৃষ্ণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, তাই স্বাভাবিক সৌজন্যবশতঃ মুখের উপর যাব না কথাটা তিনি বলেননি, কিন্তু বাস্তবে তিনি যাননি। ব্যক্তিগত জীবনে এই আচরণের নীতিগত একটা দিক রয়েছে, তা হল, কোন ধর্মস্থানে তিনি যাবেন না।

বিদ্যাসাগরের জীবনের অসংখ্য দৈনন্দিন ঘটনা ও আচরণের মধ্যে তার চরিত্র ও চিন্তার অসাধারণ রূপটি দেখা যায়। সমাজে আধুনিক জীবনরীতি প্রচলনের জন্যে তার প্রয়াস ছিল বহুমুখী। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যখন ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করেন, বিদ্যাসাগর তখন এক হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং বিজ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। আবার যখন কুসংস্কারের জন্য দেশের মানুষ গো-বীজ থেকে তৈরী বসন্তের টিকা নিতে নারাজ হচ্ছিল, বিদ্যাসাগর নিজে আধুনিক টিকা গ্রহণে দেশবাসীকে উৎসাহিত করেছিলেন। জীবনে ও মননে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী আধুনিকতার পূজারী।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগটা আমরা আজ পিছনে ফেলে এসেছি। বিগত দুশো বছরে সমাজ বদলে গেছে, দেশ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। আজকের সমাজের সমস্যা আলাদা, আজকের শোষণের রূপও আলাদা। তাই আজকের মানবমুক্তির সংগ্রামের আদর্শ ও কর্মপন্থাও ভিন্ন ধরণের। আজ সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামেই মানবমুক্তির সংগ্রাম। সর্বহারা শ্রেণি সংগ্রামও শুধু শ্লোগান দিয়ে হতে পারে না। সর্বহারা বিপ্লবীরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছিন্নমূল হতে পারে না। আজ যারা উন্নততর সর্বহারা শ্রেণির সংস্কৃতি, উচ্চ রুচি ও আদর্শকে নিজেদের জীবনে অনুসরণ করতে চান, সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁদের হতে হবে বিদ্যাসাগরের বলিষ্ঠ পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তার যোগ্য উত্তরসূরী।

....এদেশে সংস্কৃতি জগতে আজ একদিকে যেমন সবরকম সাম্রাজ্যবাদী নোংরামি ছেয়ে ফেলেছে, তেমনি একে দেখিয়েই একদল ধর্মের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে এবং দেশকে ধর্মীয় উগ্রতা কূপমণ্ডুকতার দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। আজকে দেশের সংস্কৃতি জগত, সমাজ মনন এই দু'ধরণের বিপদের সম্মুখীন। এর হাত থেকে মুক্ত করে একটা সুস্থ সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিদ্যাসাগরের জীবন ও চিন্তার অনুশীলন অত্যন্ত জরুরী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু ! – উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!
দানে বারি নদীররূপ বিমলা কিঙ্করী ;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘশিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি ;
পরিমলে ফুল - কুল দশ দিশ ভরে ;
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এলো প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরালো প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা।
হে বিদ্যাসাগর, পূর্বদিগন্তের বনে-উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পূণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে মহাক্ষণে।

সাগর তর্পণ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বীরসিংহের সিংহ শিশু ! বিদ্যাসাগর বীর !
উদ্বেলিত দয়ার সাগর – বীর্যে সুগম্ভীর।
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়

নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার।
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।
দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার,
সৌম্য মূর্ত্তি, তেজের স্ফূর্ত্তি চিত্ত চমৎকার।

নামলে একা মাথায় নিয়ে মায়ের আশীর্বাদ,
করলে পূরণ অনাথ আতুর অকিঞ্চনের সাধ,
অভাজনে অন্ন দিয়ে বিদ্যা দিয়ে আর –
অদৃষ্টেরে ব্যর্থ তুমি করলে বারম্বার।

বিশ বছরে তোমার অভাব পূরল নাকো, হায়,
বিশ বছরের পুরানো শোক নূতন আজো প্রায়,
তাই তো আজি অশ্রুধারা ঝরে নিরন্তর;
কীর্ত্তিঘন মূর্ত্তি তোমার জাগে প্রাণের পর।

স্মরণ -চিহ্ন রাখতে পারি শক্তি তেমন নাই,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই যাতে সে, মূরৎ নাহি চাই;
মানুষ খুঁজি তোমার মত,– একটি তেমন লোক–
স্মরণ চিহ্ন মূর্ত্ত ! – যে জন ভুলিয়ে দেবে শোক।

রিক্ত হাতে করবে যে জন যজ্ঞ বিশ্বজিৎ–
রাত্রে স্বপন চিন্তা দিনে দেশের দশের হিত,–
বিঘ্ন বাধা তুচ্ছ করে লক্ষ্য রেখে স্থির
তোমার মতন ধন্য হবে – চাই সে এমন বীর

তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধূলায় ধূসর বাঁকা চটি ছিল যা ওই পায়;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার।
সেই যে চটি দেশী চটি – বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আনব তারে, এই আমাদের পণ
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাকব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দীগাঁয়।

রাখব তারে স্বদেশ প্রীতির নূতন ভিতের প'র
নজর কারো লাগবে নাকো, অটুট হবে ঘর।
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার —
বিদ্যাসাগর বিমুখ হত — অমর্যাদায় যার।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর–
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।

দেখুক, এবং স্মরণ করুক সব্যসাচীর রণ–
স্মরণ করুক বিধবাদের দুঃখ- মোচন পণ।
স্মরণ করুক পান্ডারূপী গুন্ডাদিগের হার,
''বাপ, মা, বিনা দেব্‌তা সাগর মানেই নাকো আর।''

অদ্বিতীয় বিদ্যাসাগর ! মৃত্যু বিজয় নাম,
ঐ নামে হায় লোভ করেছে অনেক ব্যর্থকাম ;
নামের সঙ্গে যুক্ত আছে জীবন-ব্যাপী কাজ,
কাজ দেবে না ? নামটি নেবে ? — একি বিষম লাজ !

বাংলা দেশের দেশী মানুষ ! বিদ্যাসাগর ! বীর !
বীরসিংহের সিংহশিশু ! বীর্য্যে সুগম্ভীর !
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর

পূর্ণেন্দু পত্রী

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
ভীষণ বাজে লোক
বলতো কিনা বিধবাদের
আবার বিয়ে হোক ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
দেখতে এলেবেলে
চাইতো কিনা লেখাপড়া
শিখুক মেয়ে, ছেলে ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
দেমাকধারী ধাত
সাহেব যদি জুতো দেখায়
বদলা তৎক্ষণাৎ।

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
কপালে তার গেরো
ওষুধ দিয়ে বাঁচায় কিনা
গরীব-গুর্বোদেরও ?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
মগজটা কি ফাঁকা ?
যে যেখানে বিপন্ন তাঁর
জোগানো চাই টাকা ?

সাগর সঙ্গমে

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

সাগর ! সাগর ! বিদ্যাসাগর ! নেই সাগরের শেষ
আজও সবাই তাই খুঁজে পাই তোমার জ্ঞানের রেশ !
সাগর ! সাগর ! দয়ার সাগর ! বিশাল তোমার মন
বীরসিংহের সিংহ শাবক সবার আপনজন !!

সাগর ! সাগর ! গুণের সাগর ! যায় না দেওয়া দাম
মানব-মনের মণিকোঠায় থাকবে লেখা নাম !
বিদ্যাসাগর ! দয়ার সাগর ! গুণের সাগর তুমি
তোমার নামে মুগ্ধ মানুষ, শুদ্ধ ভারতভূমি !!!

মূক-মুখে দাও ভাষা তুমিই যোগাও আলো-আশা
মনের কোণে স্বপ্ন বনে তোমার ভালোবাসা !
বিদ্যাসাগর তোমার কাছে আমরা সবাই ঋণী
দুঃখে-সুখে সবার বুকে থাকবে চিরদিনই !!

বীরসিংহের সিংহ শিশু সত্যি তুমি বীর
তোমার নামে শহর-গ্রামে তাই জমে আজ ভীড় !
ঠাকুরদাস আর ভগবতীর দরিদ্র দীন ছেলে
পরিশ্রম আর অধ্যবসায় দিয়েই জীবন পেলে !!

লাঞ্ছিত আর বঞ্চিতদের জন্যে জ্বেলে আলো
ঘুচিয়ে আঁধার বিঘ্ন-বাধার অশিক্ষা-মেঘ কালো !!
ছিলে আছো থাকবে তুমি সত্যি সবার প্রিয়
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর শ্রদ্ধা-প্রণাম নিও !!

বিদ্যাসাগর স্মরণে গান

শিল্পী-মান্না দে
গীতিকার- দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
সুরকার - মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অবিদ্যাকে বিদ্যা দিলে অশিক্ষাকে শিক্ষা
তোমার কাছে সবাই নিলাম জীবন গড়ার দীক্ষা
বিদ্যার সাগর তুমি আর তারই ঈশ্বর
বিদ্যা সাগর বিদ্যা সাগর বিদ্যার সাগর
বর্ণ পরিচয়ে প্রথম বর্ণ চেনা শুরু
সমাজ সংস্কারের পথে তুমি শিক্ষাগুরু
নতুন ভারত গড়ার তুমি স্বার্থক করিগর
বিদ্যা সাগর বিদ্যা সাগর বিদ্যার সাগর
তুমি দিলে নারীর শিক্ষা বিধবা বিবাহ
জুড়িয়ে দিলে তুমি কত বেদনারই দাহ
এ যুগের ঈশ্বর তুমি জেনেছে অন্তর
বিদ্যা সাগর বিদ্যা সাগর বিদ্যারই সাগর।

বিদ্যাসাগর স্মরণে গান

শিল্পী-শুক্লা কাউরী

চটি ধুতি পাঞ্জাবীতে পুঁথি হাতে জড়িয়ে চাদর
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর
তুমি কি আসবে আবার
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর,
তোমাকে আসতে হবে এ বলার সাহস কোথায়
বইছে রক্ত তোমার ক'জনার দেহের শিরায়
গরীবের দুঃখ ব্যথায় ক'জন আজ পাশে দাঁড়ায়
ক'জন আর কথায় কাজে
দিচ্ছে বল তোমার কদর
তুমি কি আসবে আবার দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।
বলেছিলে ঐক্য শেখো শপথের বাক্য পড়ে
জড়ো করে মানিক্য সব নিতে চাও দেশটা গড়ে
ঐক্যে ফাটল ধরায় বাক্যে মানুষ ঠকায়
বেচে খায় মাণিক্য হায় এই তোমার দেশের খবর
তুমি কি আসবে আবার দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর
শেখালে ও মায়ের জাতি বোবারাও কইবে কথা
ঘোচাতে বিধবা আর বালিকা ও বধূর ব্যথা
আজও তো দাসীর জীবন আঁধারে গুমরে মরে
বধূ হয় পণের বলি সতী হয় চিতার পরে
দেহটাকে পণ্য করে বেচাকেনা হয় বাজারে
আধুনিক সভ্য দেশের জ্ঞান গরিমায় এই তো বহর
তুমি কি আসবে আবার দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর
না এলেও আড়াল থেকে আমাদের সাহস দিও
নিভু দ্বীপ জ্বালব মশাল এ তুমি দেখে নিও
ও জীবন সাগর থেকে আনব নতুন জোয়ার
ভরা হোক ফুলে ফলে ঊষার এই দুকুল আবার
বোবারাও কইবে কথা
ঘোচাতে দুঃখ ব্যাথা
সরাবই বধূ মাতার বুক থেকে এই
জাঁতার পাথর
তুমি কি আসবে আবার
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

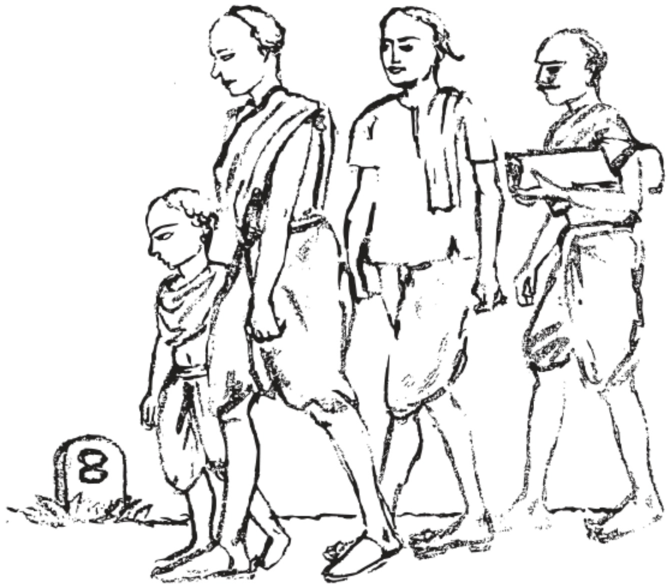

ঈশ্বরের প্রথম কলকাতা যাত্রা

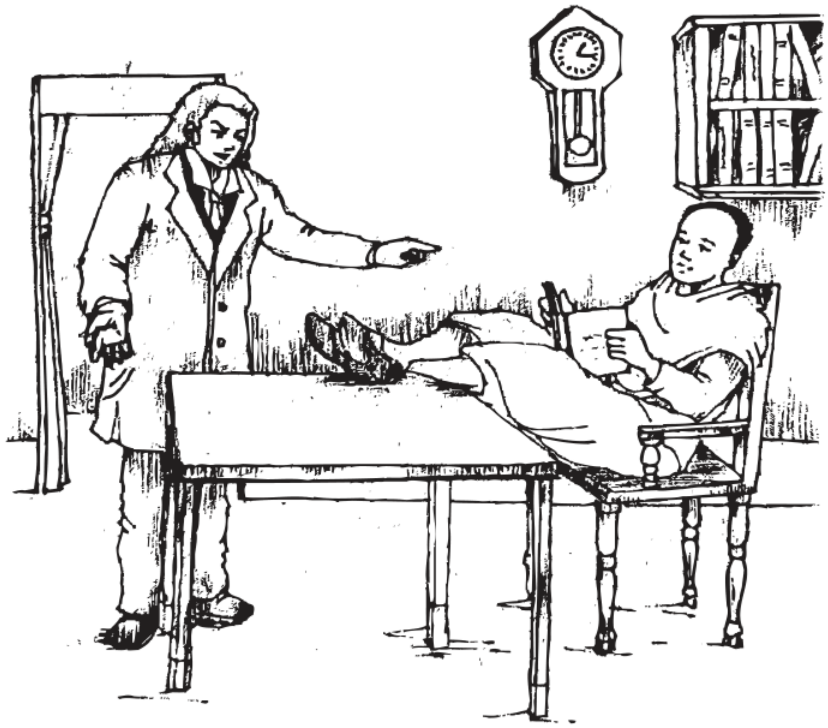

কার সাহেবের অপমানের প্রত্যুত্তরে

২য় পর্ব

এই পর্বে
থাকছে ছাত্র-
ছাত্রীদের লেখা
কয়েকটি
কবিতা
এবং সেইসঙ্গে
অন্যান্য বিশিষ্ট
কবি,
সাহিত্যিক,
গুণীজনদের
কলমে কবিতা,
গান ও প্রবন্ধ।

সিংহ তারা

চিরন্তনী জানা

বিদ্যাসাগর নামে তুমি খ্যাত জগৎ জনে
করুণার সিন্ধু তুমি সবাইতো তা জানে,

বর্ণপরিচয় লিখে তুমি দিলে শিক্ষার আলো
তোমার থেকে নারীজাতি বাঁচার দিশা পেল,

বিধবাদের বিয়ে দিয়ে ফেললে তুমি সাড়া
তুমিতো সেই বীরসিংহের সিংহ নামক তারা।

বিদ্যাসাগর

দীপ দাস অধিকারী

জ্ঞানী ছিলেন তিনি
বিদ্যাসাগর উপাধিতে
আমরা তাঁকে চিনি।

সহজ সরল মনের
চিরদিনই পরোপকার
করেছে লোকজনের।

পড়াশুনায় ভালো
গ্রামে গ্রামে স্কুল গড়ে
দিলেন জ্ঞানের আলো।

দয়ার সাগর

লক্ষ্মী রাণী দাস

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর
দয়ার সাগর তুমি,
তোমায় নিয়ে গর্ব করে
এই বঙ্গভূমি
নারীদের কে সম্মান দিলে
দিলে বিদ্যালয়
এগিয়ে যাওয়ার সাহস দিলে
দিলে পরিচয়
বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর তোমার কথা ভাবি
সবাই শিখুক লেখাপড়া এটাই তোমার দাবি
দিশাহীন কে দিশা দিলে
বিধবাদের প্রাণ
তোমায় কি গো ভুলতে পারি
জানাই শত প্রণাম।

দয়ার সাগর

তপন কুমার দাস

বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর,
সব লোকেই জানে,
যুগে যুগে পূজ্য হবেন,
এটাই সবাই মানে।
তাঁরই দয়ায় বিধবাদের
জীবনে এলো মুক্তি
রক্ষণশীল যুগে একাই
দিলেন অকাট্য যুক্তি।
পরের দুঃখে কাঁদেন তিনি
অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ
বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ,
করেন তিনি রুদ্ধ।
কতদিন-হীন আত্মীয়-স্বজনের
করেছেন তিনি সেবা।
সেবায় নামলে হয়নি মনে
রাত্রি কি দিবা।
দুঃখের কথা এলে কানে
ঝাঁপিয়ে পড়েন ত্রাণে
তিনি আমাদের বিদ্যাসাগর,
সবাই এটা জানে।

বিদ্যাসাগর

মহামায়া রায়

বিদ্যার সাগর করুণা সাগর জ্ঞানের আকর তুমি,
বাংলা মায়ের কৃতি সন্তান তোমার চরণে নমি।
শিক্ষা বিস্তারে নিরলস, তুমি সর্বদা,
আর্তের সেবায়, হয়নি কখনো অন্যথা।
বিদেশে মাইকেলের অর্থাভাব শুনি,
শীঘ্র দাতার ভূমিকায়, অবতীর্ণ তুমি।
নারীর যোগ্য মর্যাদায় প্রয়াস অনন্য,
বিধবা বিবাহ চালুতে সত্যই তুমি ধন্য।
বাংলা গদ্যে তব স্থান স্বর্ণাক্ষরে লেখা,
বর্ণপরিচয় অক্ষর শৈশবে পাই দেখা।
লক্ষ্যে স্থির, সংকল্পে অটল জ্বালিয়ে ভাষণের আলো,
পুত্রের মত কন্যাকে তুমি দিলে শিক্ষার আলো।
সবার স্মৃতিতে চির অম্লান, চির মহীয়ান তুমি,
দুশো বছরের জন্ম বছরে তোমার চরণে নমি।

বিদ্যাসাগর

হরিপদ জানা

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর নাম ।
ঠাকুরদাস আর ভগবতীর ঈশ্বর সু-সন্তান ।
মেদিনীপুরের বীরসিংহ তাইতো নতুন ধাম ।
ছেলে মেয়ে দাদু নাতির সবার অন্তপ্রাণ ।
হাতে খড়ির পরেই মোরা তোমার দেখা পাই।
মিছা কথা কহিও না, প্রথম ভাগে পাই ।
জটিল কঠিন বাক্য গুলোর বানান লিখি পড়ি ।
দ্বিতীয় ভাগের পাতায় তোমার যুক্তাক্ষর ধরি ।
তৃষ্ণাতুরকে জল দিবে আর অন্ন দরিদ্রকে।
দুর্বলের যে রাগটি বৃথা শুনি তোমার মুখে ।
অন্যের বিপদে আহ্লাদিত হইও না ভাই।
চুরি করা বড় যে দোষ দ্বিতীয় ভাগে পাই।
কর-খল-ঘট-জল তোমার কাছেই শেখা ।
তোমার স্মৃতি অম্লান হোক, হৃদয়ে থাক লেখা।

প্রাতঃ স্মরণীয় মনীষী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি

কালীশংকর গাঙ্গুলী

বঙ্গের প্রথম সূর্য, তমো অবসান,
জ্ঞানের সাগর, সিন্ধু, দয়াময় নাম।
আদি শিক্ষাগুরু তুমি, প্রদীপ বাংলার,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর, যত বঙ্গ ললনার।
সুউচ্চ নগেন্দ্র বক্ষে হিমবাহ ধারা
ঋজু পথে প্রবাহে যে, বক্রে নহে হারা।
অভ্রভেদী স্থির শির তেমনি তোমার,
বক্ষে বহে হিমবাহ, চির করুণার।
পুণ্য সে তুষার ধারে সিক্ত বঙ্গদেশ,
কত শত আর্তজনে ঘুচায়েছে ক্লেশ।
মনুষ্যত্বের অক্ষয় সৌধ, তুমি বটতরু,
বঙ্গভূমি তীর্থক্ষেত্র, বন্দেন কবিগুরু।
তীর্থে বঙ্গে, তব সৌধে, নত শিরে আজ,
মহত্ত্বের দীক্ষা লভি দূর হোক লাজ।

বিদ্যাসাগর

সুপর্ণা

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর এমন পুণ্য নাম,
বিদ্যাসাগর মানেই যেন জীবন্ত সংগ্রাম।
বীরসিংহের দস্যি বালক অবাক মেধা তাঁর,
একাই তিনি বৃক্ষ হলেন তিনিই কার্মাটার।
মেদিনীপুরের গাঁয়ের ছেলে কলকাতাতে পাড়ি,
পিতামহ পিতৃদেবের নিলেন আশীষ বারি।
জননী তাঁর কোমল হৃদয় অন্নপূর্ণা রূপ,
মায়ের মতো তিনি যে তাই দুঃখে র'ন অটুট।
জয় করলেন তিলোত্তমা ধুতি চাদরে মুড়ে,
দীপশিখাটি জ্বালিয়ে দিলেন অশিক্ষার ধারে।
অভাবে তাঁর নিজের যাপন তবুও ভাবেন অন্যে।
জীবন যেন বইয়ে দিলেন অসহায়ের জন্যে।
তিনিই যে জ্বলন্ত রূপ অনন্য সেবার
ব্রিটিশ মুখ ফিরিয়ে দিলেন বাঙালী অহংকার।
একটা বুড়ো অনেক বিয়ের অধিকার কেন নেবে!
ছোট মেয়েটির বিধবা জীবন, সংসার চাই তবে।
দেবদূত যে মর্তে এলেন পরিচয় দিতে বর্ণে
জন্মান্তরের সুখ ছড়ালেন কেবল এক জন্মে।
বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর বন্ধু এমন তুমি,
সৌম্য মূর্তি তেজের স্ফূর্তি ধন্য ভারত ভূমি।

কেমন সাগর

সুহৃদ বিলাস দাস

সাগর মানেই আমরা জানি নোনা জলে ভরা,
একটি সাগর কি করে হয় রক্তমাংসে গড়া !
কিবা আছে তারই মাঝে কেন এমন নাম,
কে'বা সেই মহামানব কোথায় যে তার ধাম !
তিনি যে এক বাঙ্গালী বীর ষোলআনাই খাঁটি,
পরনে তার ছিল সদাই ধুতি-চাদর-চটি !
সবাই চেনে বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর নামে,
জন্মেছিলেন মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে।
সাগর সমান বিদ্যা যে তার নাইকো দয়ার শেষ,
উজাড় করে দিতেন সবই খুশি মনেই বেশ।
সবাই পড়ি তারই লেখা বর্ণপরিচয়,
মোদের মুখে ফোটায় ভাষা ঘটায় বোধোদয়।
অনুসরণ করবো তাঁরই জীবনী আর বাণী,
চলার পথ হবেই সুগম আলোক পাব জানি।

করুণা সিন্ধু

শেখ্ আকবর

বিদ্যার সাগর তুমি করুণাতে সিন্ধু,
উজ্জ্বল আলো তুমি দীনহীনের বন্ধু।
তরু তুমি ছায়া দাও ক্লান্তি কর দূর,
হাতে খড়ি, মুখে ভাষা, জ্ঞানের রোদ্দুর।
পীড়িত অসহায় যত বুকে টেনে নিলে,
মলিনতা দূর করে সুধা ঢেলে দিলে।
প্রত্যুষে বিভা তুমি আলোর রশ্মিছটা,
ভাষার প্রাঙ্গনে তাই তোমার ঘনঘটা।
নারীর শিক্ষা, বিধবার বিয়ে, বাল্যবিবাহ রোধ,
তোমার ছিল এটাই ব্রত এমন বিবেক বোধ।
কীর্তিগাথা জীবন তোমার তোমায় খুঁজি যত,
মধুমাখা হৃদয় তোমার ব্যাকুল করে তত।
কোন সে জাদুর মায়া জালে জড়ালে বারবার,
বিভোর হলো বঙ্গবাসী তোমায় নমস্কার।

বিদ্যাসাগর স্মরণে গান

কথা- ভূষণ চন্দ্র মণ্ডল
সুর-মনতোষ পাল

বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর
বিদ্যাসাগর নাম
একটি যেন আলোর শিখা
চির অম্লান

নারী মুক্তি আন্দোলনে সঁপেছিলেন প্রাণ
আমরা কি তা ভুলতে পারি তার সে অমর দান।
ঘুম ভাঙালেন হয়ে ভোরের পাখি
তাঁর স্মৃতি তাই হৃদয় ভরে রাখি
আঁধার মাঝে আলো জ্বেলে
দিলেন মোদের মান।

দুঃখীর ব্যথা বেজেছিল বুকে
দয়ার সাগর বলতো তারে লোকে
সেই সাগরে আমরা সবাই
আজও করি স্নান।

বিদ্যাসাগরের পার্থিব মানবতাবাদী শিক্ষাচিন্তা

দেবাশিস আইচ

ব্রিটিশ শাসনের হাত ধরে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হয়। আনুষঙ্গিক ফল হিসেবে ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ইউরোপীয় নবজাগরণের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁদের অগ্রপথিক রামমোহন (১৭৮২-১৮৩৩ খ্রিঃ) এর চিন্তা ছিল ইউরোপীয় নবজাগরণের মানবতাবাদী চিন্তার আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁর হাত ধরেই এদেশে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। তবে তিনি গোঁড়ামি ও তমসাচ্ছন্ন ভাবনা-ধারণা এবং আচার-আচরণ থেকে মুক্ত করে ধর্মেরই সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহনের ঠিক পরে পরে ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১ খ্রিঃ) এবং ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটির আন্দোলন ধর্মীয় চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিল। উগ্রতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিচারিতার কারণে ইয়ং-বেঙ্গলরা বৃহত্তর সমাজকে স্পর্শ করতে না পারলেও ডিরোজিও'র হাত ধরে তারা বেকন, হিউম ইত্যাদি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চিন্তাবিদদের রচনার সংস্পর্শে এসেছিল। সব মিলিয়ে কলকাতা তখন পুরনো ও নতুন চিন্তার সঙ্ঘর্ষের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার বহু সভা সমিতি। এইরকম একটা পরিমণ্ডলের কলকাতাই ছিল বিদ্যাসাগরের ছাত্রাবস্থা (১৮২৯-১৮৪১ খ্রিঃ) ও যৌবনের বিচরণ ক্ষেত্র। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় যে গুণী অধ্যাপকদের স্নেহের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন তাঁদের অনেকেই সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও গোঁড়ামি ও ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত উদার মনের অধিকারী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী গ্রামীণ ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা ও বধু হয়েও উদার এবং দরদী মনের অধিকারিণী ছিলেন। পিতামহ ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ঋজু চরিত্রের মানুষ। পিতা পুজো-আচ্চা-যজমানীর পরিবর্তে পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য জীবিকাকে সম্মানের বলে বেছে নিয়েছিলেন।

শৈশব-কৈশোর-তরুণ বয়সের এই পরিবেশ থেকে বিদ্যাসাগর তাঁর সরল, উদার, সত্যনিষ্ঠ এবং মমতাময় অথচ দৃঢ় ও আপোষহীন মানসিক কাঠামোটি গড়ে নিয়েছিলেন, অনুশীলনের ক্ষেত্রে আয়ত্ব করেছিলেন অপরিসীম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়। পরবর্তীকালে তেজোদ্দীপ্ত পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তার

অধিকারী হওয়া, জীবনে, আচার-আচরণে সেই চিন্তার বাহুল্য বর্জিত অথচ সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা এবং তার ভিত্তিতে সামাজিক আন্দোলনের সূচনা ঘটানো ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ভেতরের এবং বাইরের কোনো বাধাকে পরোয়া না করার সাহস এবং ধৈর্য শৈশবে-কৈশোরে তিনি এভাবেই অর্জন করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ইংরেজি শিখেছিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে; ছাত্রজীবন শেষ করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইউরোপীয় ছাত্রদের সঙ্গে নানা আলাচেনা প্রসঙ্গে এবং তাঁর বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তিগত ইংরেজি শিক্ষকদের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। পরে ইউরোপ থেকে বই আনিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক হিসেবে প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এবং পরে সংস্কৃত কলেজের এবং স্কুলের ছাত্রদের বাংলা শিক্ষার জন্য তিনি ইংরেজি সাহিত্য থেকে অনুবাদের সূত্রেও পাশ্চাত্য চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, বস্তুবাদী দর্শন, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চিন্তা তাঁর ভাব জগতকে পুষ্ট করেছিল।

বিদ্যাসাগরের চিন্তা ছিল ধর্মীয় প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তা। তিনি ছিলেন ভারতীয় নবজাগরণের বলিষ্ঠতম প্রতিনিধি। ব্যক্তিগত জীবন, সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং আরও নানা ক্ষেত্রে তাঁর পার্থিব মানবতাবাদী আদর্শের অভূতপূর্ব প্রকাশ ঘটেছিল। তবে সম্ভবত শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রেই তাঁর এই আদর্শ সবচেয়ে উজ্জ্বল ও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর নানা ধরণের শিক্ষাকর্ম এবং শিক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও শিক্ষা বিষয়ে তিনি বড় বড় প্রবন্ধ লিখে যান নি। পার্থিব মানবতাবাদী আদর্শকে পাথেয় করে তিনি কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন সমাজে ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার আলো জ্বালানো এবং এইভাবে পুরাতন সমাজের "সাত পুরু মাটি উপড়ে ফেলে নতুন মানুষের চাষ" করার প্রাণপণ চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার পরিচয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন থেকে শুরু করে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে শিক্ষা পরিচালনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের পরিকল্পনার প্রথম প্রকাশ ঘটে সম্ভবত তাঁর পাঠ্য পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে। তিনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন কিন্তু কোন পুস্তকে আধ্যাত্মবাদ প্রচার করেননি। তাঁর প্রণীত বর্ণপরিচয় ও বোধদয় বহু মিশনারি স্কুলে চলত। বইগুলিতে ঈশ্বর-মাহাত্ম্য নেই বলে মিশনারি জন মার্ডক মিশনারি স্কুলের পাঠ্য থেকে বোধদয় ও

বর্ণপরিচয় বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর লেখা 'জীবনচরিত' ও 'চরিতাবলি' পুস্তকে বিদ্যাসাগর কোনো ধর্মীয় মহাপুরুষের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করেননি। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানী এবং ছোট বেলায় দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন মানুষদের জীবনী তিনি বেছে নিয়েছিলেন ছাত্রদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুরাগ এবং অদৃষ্ট বা দৈবে নির্ভরতার পরিবর্তে সংগ্রামের মাধ্যমে বড় হওয়ার পথের বাধা চূর্ণ করার সাহসের জন্ম দিতে চেয়েছিলেন। এমনকি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক অবলম্বনে রচিত তাঁর 'শকুন্তলা' (গদ্য)-য় বিদ্যাসাগর মূল কাব্যের অলৌকিক অংশগুলি যতদূর সম্ভব বাদ দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সেক্যুলার শিক্ষাচিন্তার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টার মধ্যে।

সংস্কৃত কলেজে দু'দফায় যুক্ত থাকাকালীন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি এই উদ্দেশ্যে মোট তিনটি রিপোর্ট রচনা করেন। প্রথমটি ১৮৪৬-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হিসেবে তিনি সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে পেশ করেন কাউন্সিল অফ এডুকেশনে পাঠানোর জন্য। দ্বিতীয়টি কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারি F J Mouat এর অনুরোধে রচনা করে তাঁর কাছেই পেশ করেন ১৮৫০ এর ডিসেম্বরে। তখন তিনি দ্বিতীয়বার সংস্কৃত কলেজে যোগ দিয়েছেন সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে। প্রিন্সিপাল হওয়ার পর তাঁর রচিত তৃতীয় রিপোর্টটি দ্বিতীয় রিপোর্টটিরই আরও পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত রূপঃ 'NOTES ON THE SANSCRIT COLLEGE (১২ এপ্রিল, ১৮৫২)। Notes-টি ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব ১৬ জুন তাঁর সমর্থন সমেত কাউন্সিল অফ এডুকেশনের কাছে পেশ করেন।

রিপোর্টগুলিতে বিদ্যাসাগর বলেন, ছাত্রদের পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান ও সভ্যতা-র জ্ঞানার্জন প্রয়োজন" (প্রথম রিপোর্ট)। তিনি স্মৃতি শ্রেণীর পাঠ্য থেকে অষ্টবিংশতি তত্ত্ববাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন, কারণ "যদিও তারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কাজে লাগে, তবুও তারা মোটেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমের উপযুক্ত নয়...।" ন্যায় শ্রেণীর পাঠ্য অনুমান চিন্তামণি সম্বন্ধে বলেছেন "এটা পড়াতে গেলে অনতিক্রম্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে"; "খণ্ডন-কে বলেছেন পঙ্কিল অধিবিদ্যা; তত্ত্ব বিবেক সম্বন্ধে বলেছেন "এটি বৌদ্ধ এবং নাস্তিক দর্শনকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে এবং একজন বিশ্বস্রষ্টার আবশ্যিকতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রচিত"; এবং এগুলিকে তিনি ন্যায় শ্রেণীর পাঠ্য থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। হিন্দু দর্শন পাঠ প্রসঙ্গে বলেছেন, "এগুলিতে সুগভীর জ্ঞানের প্রয়োজন

নেই; হিন্দু দর্শনের পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা কমানোর প্রস্তাব করে বলেছেন, এইগুলির অধ্যয়ন করলেই খুব বেশী সময় খরচ না করেও একজন হিন্দু দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে।" বলেছেন হিন্দু দর্শন এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন উভয়ই পড়াতে হবে, যাতে "... এইভাবে শিক্ষিত যুবকরা প্রাচীন হিন্দু দর্শনের ভ্রান্তি গুলিকে ভালভাবে উন্মোচিত করতে পারবে।"৩ গণিতের পাঠ্যক্রম থেকে সংস্কৃতে রচিত লীলাবতী এবং বীজগণিত বই দুটি বাদ দিতে বলছেন কারণ "... সূত্র এবং প্রশ্নগুলিকে শ্লোকের আকারে পরিবেশন করে লেখক এগুলিকে এত জটিল করে তুলেছেন যে ছাত্ররা এতে প্রবেশই করতে পারবে না। সংস্কৃত-গণিত শুধু যে কোনো কাজের নয় তাই নয়, তা অন্য বিষয় অধ্যয়নেও বাধা সৃষ্টি করে, অত্যধিক শ্রম ও সময় কেড়ে নেয় যা অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয় করা যেত; এবং বলেছেন ইংরেজিতে গনিত শিক্ষা দিতে, কারণ, তাহলে ".. অর্ধেকেরও কম সময়ে একজন বুদ্ধিমান ছাত্র দ্বিগুণেরও বেশী মূল্যবান জ্ঞান আহরণ করতে পারবে। শুধু তাই নয় ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকদের সম্বন্ধে তিনি বলেন "... বর্তমান শিক্ষকরা গণিত এবং প্রাকৃতিক দর্শনে যথেষ্ট পারদর্শী নয়। আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, সংস্কৃত কলেজের জন্য যে ধরণের শিক্ষক দরকার তাঁরা তা নয়।"

ব্রিটিশ সরকার এদেশে শিক্ষা বিস্তার করতে চেয়েছিল ততটুকুই যাতে এদেশে তাদের প্রশাসনিক কাজকর্ম মসৃণভাবে চলতে পারে। আধুনিক দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতির সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচিতি ঘটানো তাঁদের লক্ষ্য ছিলনা। বরং তারা চাইত এদেশের যুবকদের মন ছেয়ে থাকুক ভাববাদী চিন্তা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে। তাই এদেশের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের তারা ঘাঁটাতে চাইত না। অন্যদিকে এদেশে শিক্ষা পরিচালনার কাজে ব্রিটিশ সরকারের পছন্দের ছিলেন হিন্দু ও পাশ্চাত্য ভাববাদী দর্শনের সমর্থক ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং পণ্ডিতরাই। বারাণসীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল Dr. J.R. Ballantyne ছিলেন তেমনই একজন লোক। তাই সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে বিদ্যাসাগর তাঁর উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করা শুরু করতে না করতেই কাউন্সিল অফ এডুকেশন ১৮৫৩-এর মাঝামাঝি ব্যালান্টাইনকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শনের দায়িত্ব দেয় এবং ব্যালান্টাইনের দেওয়া রিপোর্টটি ২৯ আগস্ট ১৯৫৩ বিবেচনার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠায়। বিদ্যাসাগরের উত্তরে কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে তাঁর রিপোর্ট পাঠান ৭-সেপ্টেম্বর [৫]। এই রিপোর্টটি বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দলিল।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে চালু করেছিলেন John Stuart Mill-এর

বস্তুবাদী দর্শনের বই 'The Logic of The Moral Sciences'। এই বইয়ের বদলে ব্যালান্টাইন তাঁর নিজের লেখা এর একটি সংক্ষিপ্তসার চালু করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সংক্ষিপ্তসারের পরিবর্তে মূল বইটি পড়ানোর পক্ষেই তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

ব্যালান্টাইন আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, "সংস্কৃত ও ইংরেজি (ইউরোপীয়) এই দুই ভাষায় সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য দুই বিপরীত দর্শনের শিক্ষা থেকে ছাত্ররা মনে করবে সত্য দ্বিবিধ (truth is double) এবং তাদের মধ্যে সত্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।" উত্তরে বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে বলেন, "যথাযথভাবে বুঝলে সত্য সত্যই। সত্য দ্বিবিধ এমন বিশ্বাস সত্য সম্পর্কে অসম্পূর্ণ প্রত্যয়ের ফল। আমি নিশ্চিত যে এই প্রতিষ্ঠানে যে উন্নত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় তাতে এমন হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়েছে।" ব্যালান্টাইন তাঁর প্রস্তাবে বলেন, "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয় বিদ্যায় পারদর্শী একদল মানুষ তৈরি করা, যারা এক ভাষার জ্ঞানকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে এবং দুয়ের আপাত বিরোধের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য দেখাতে পারবে, হিন্দু শাস্ত্রে যে সত্যের বীজ আছে ইউরোপীয় বিজ্ঞান যে সে সমস্তকে স্বীকার করে তা দেখিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপের প্রগতিশীল বিজ্ঞানকে গ্রহণযোগ্য করবে।" এই পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে বলেন, "আমার মনে হয়না আমরা সকল ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে প্রকৃত সামঞ্জস্য দেখাতে পারব। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে আমরা তা পারব তাহলেও আমার মনে হয় শিক্ষিত ভারতীয়দের কাছে ইউরোপের প্রগতিশীল বিজ্ঞানকে গ্রহণযোগ্য করা অসম্ভব কাজ। তাঁরা এমন একদল লোক যাঁদের দীর্ঘদিনের অন্ধতা টলবার নয়। কোন নতুন ধারণা হোক, বা তাঁদের শাস্ত্রে বীজ আকারে আছে এমন কোন ধারণার উন্নত রূপ হোক, তাঁদের নজরে নিয়ে এলে তাঁরা তা গ্রহণ করবেন না। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের শাস্ত্র সর্বজ্ঞ ঋষিদের মুখনিঃসৃত সুতরাং সেগুলি ভুল হতে পারে না। সম্প্রতি ভারতের এই অংশ, বিশেষ করে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পণ্ডিত(learned)-দের মধ্যে একধরণের মানসিকতা দেখা যাচ্ছে; যখন তাঁরা কোন নতুন বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা শোনেন যার বীজ তাঁদের শাস্ত্রে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, তখন সেই সত্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার পরিবর্তে বিজয়গর্বে নিজেদের শাস্ত্রের প্রতি তাঁদের কুসংস্কারগ্রস্ত শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে যায়।" এই রিপোর্টে অন্যত্র তিনি বলেন, "তাঁদের (ওই ধরণের পণ্ডিতদের) মন জুগিয়ে চলার প্রয়োজন আমাদের নেই, কেননা তাঁদের কোন রকম সাহায্য আমাদের দরকার

নেই। বাংলার যে অংশে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে সেখানেই এই পণ্ডিতরা তাঁদের আধিপত্য হারাচ্ছেন।" "..(সংস্কৃত কলেজের) প্রতিটি সফল ছাত্র এদেশের সকল কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবে।"৬

ব্যালান্টাইন তাঁর রিপোর্টে বলেন,"সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বিশপ বার্কলের ইনকোয়ারি পড়ানো দরকার। এর সঙ্গে সাংখ্য ও বেদান্তের সাদৃশ্য আছে।" বিদ্যাসাগর এর উত্তরে বলেন, "বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন (false systems of philosoph) এ নিয়ে এখন আর কোন বিতর্কের অবকাশ নেই।" "... কিছু কিছু কারণে, যেগুলি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, সংস্কৃত কলেজে আমাদেরকে বেদান্ত ও সাংখ্য পড়িয়ে যেতে হচ্ছে। সংস্কৃত পাঠ্যক্রমে এগুলি পড়ানোর সময় এদের প্রভাব কাটানোর জন্য আমাদের উচিৎ ইংরেজি পাঠ্যক্রমে খাঁটি (sound) দর্শন পড়িয়ে এগুলির বিরোধিতা করা। বিশপ বার্কলের ইনকোয়ারি সেই উদ্দেশ্য সাধন করবে না। বেদান্ত ও সাংখ্য-র মত এটিও একই ধরণের বা হুবহু একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এবং ইউরোপেও এটি এখন আর খাঁটি দর্শন (sound system of philosophy) হিসেবে বিবেচিত হয় না।"

বিদ্যাসাগরের উত্তরের পরেও কাউন্সিল অফ এডুকেশন ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ তাঁকে ব্যালান্টাইনের প্রস্তাব কার্যকর করার নির্দেশ দেয়। বিদ্যাসাগর এতে তীব্র আপত্তি জানিয়ে কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে ৫ অক্টোবর একটি চিঠি দেন। কাউন্সিল অফ এডুকেশন তথা ব্রিটিশ সরকার পিছু হটে।

সেই যুগে সাংখ্য ও বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন বলার জন্য সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যে সাহস এবং বস্তুবাদী প্রত্যয় দরকার তা একই সঙ্গে একমাত্র বিদ্যাসাগরের মধ্যেই ছিল; সর্বোপরি ছিল তৎকালীন সমাজের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, স্থবিরতা দূর করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। বিদ্যাসাগরের এই অবস্থান হিন্দু এবং ব্রাহ্ম দুই ধর্মেরই মূলে আঘাত করেছিল। অনেক পরে (১৯৫৭) প্রমথনাথ বিশী বলেছেন "...আজিকার দিনে কয়জন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে, লিখিত আকারে মন্তব্য করিতে পারেন যে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন ভ্রান্ত? ... ঐ এক উক্তির দ্বারা ভারতের বহুযুগসঞ্চিত সংস্কার ও অহন্মন্যতার মূলে আঘাত করেছেন।"৭ শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মীয় চিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য বিদ্যাসাগরের এই চেষ্টা অনন্য। সেসময় আরও অনেকেই ধর্মীয় চিন্তার অসারতা সম্বন্ধে অবহিত হয়েও শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পার্থিব মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালনার জন্য বিদ্যাসাগরের মতো প্রয়াসী হননি। সমাজের হিতের জন্য যা ঠিক বলে বুঝেছেন তার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করার জন্য সমাজের প্রতি যে মমত্ববোধ, চরিত্রের যে দৃঢ়তা, নির্ভীকতা এবং যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত

থাকার যে মানসিকতার প্রয়োজন ছিল তার অধিকারী সেযুগে ছিলেন একমাত্র বিদ্যাসাগরই। আজকের দিনে সরকারী মদতে এবং প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রকাশ্য/প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে অত্যন্ত সংগঠিতভাবে সারা দেশজুড়ে প্রাচীন সনাতন ভারতের অতিরঞ্জিত গৌরবগাথা ও মিথ্যা ইতিহাস প্রচার, সরকারি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গবেষণার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা, সেই অনুযায়ী স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসকে পাল্টে দেওয়া এবং কুসংস্কার মুক্ত বৈজ্ঞানিক মননের ওপর আক্রমণের যে জোয়ার শুরু হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের পার্থিব মানবতাবাদী শিক্ষাচিন্তা আজ অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্রঃ ১। বিনয় ঘোষঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান ২০১১, পৃ. ৫১৬।

২। ১৬-ডিসেম্বর, ১৮৫০ কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে লেখা চিঠি, সূত্র- ইন্দ্রমিত্রঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ ২০১৪, পৃ. ৬৪৬-৬৪৭।

৩। NOTES ON THE SANSCRIT COLLEGE&, সূত্র- ইন্দ্র মিত্র।
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ ২০১৪, পৃ. ৬৫২-৬৫৫।

৪। ইন্দ্র মিত্রঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ ২০১৪, পৃ. ১৪৪।

৫। ইন্দ্র মিত্রঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ ২০১৪, পৃ. ১৪৪।

৬। ৭-সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩ কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে লেখা চিঠি, সূত্র- ইন্দ্র মিত্রঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ ২০১৪, পৃ. ৬৫৮-৬৬১।

৭। ইদ্র মিত্রঃ করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, আনন্দ ২০১৪, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

> যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া তাহার পরম ধর্ম ও তাহার জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম।

বিদ্যাসাগর, এক অনালোচিত অধ্যায়

পরেশ বেরা

ঠিক এই সময় ভারতবর্ষের বুকে আমরা চাই বা না চাই একটি বিষয় নিয়ে সর্বত্র (অফিসে, আদালতে, চায়ের টেবিলে ইত্যাদি) অনেক বেশি বা অনেক কম হলেও আলোচনা কিন্তু হচ্ছে, সেটা হলো ভারতবর্ষের কৃষক সমাজ। যদি আলোচনাটা এরকম হয় যে ওটা কেবলমাত্র কৃষকদের সমস্যা তাহলে সে আলোচনা শুনে আমাদের লাভ নেই, কিন্তু যদি আমরা ভাবি এ সমস্যা আমাদের সকলের তাহলে অনেকেই বলবেন সে আবার কি ধরনের কথা, আমি শিক্ষক, অধ্যাপক বা অন্য কোনো চাকুরে অথবা ব্যবসায়ী, তাহলে চাষির সমস্যা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার কী?

না, কেন দরকার এই নিয়ে আমি তর্ক বিতর্ক করতে চাই না, আপনি বা আমরা কৃষকের ওপর নির্ভর কিনা, অনেক অর্থনীতির কচকচানি করে তা প্রমাণ করার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। আমি বরং উল্টোদিক থেকে কথাটা বলার চেষ্টা করি, সেটা হলো বাংলায় যারা বিখ্যাত মানুষ তারা কেন বিষয়টা নিয়ে এত মাথা ঘামিয়েছিলেন। আমরা সবাই জানি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিদ্যার সাগর', 'দয়ার সাগর' এইসব খেতাব পেয়েছিলেন অবশ্য জনগণের কাছ থেকে। কিন্তু তিনি লাঞ্ছিত, বঞ্চিত কৃষকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এই বিষয়টি মনে হয় আমরা অনেকেই জানি না।

বিদ্যাসাগরের জন্মের আগেই ইংরেজরা ভারতবাসীর কাছ থেকে বিশেষত বাংলার মানুষকে চাবুক মেরে রাজস্ব আদায় করেছে। উচ্ছৃঙ্খল রাজস্ব আদায়ের চাপে বাংলার মানুষ পেয়েছে অসহনীয় দুর্ভিক্ষ। এই ছন্নছাড়া রাজস্ব আদায়ের নীতি কে কোম্পানির পক্ষে একটু সুসংহত রূপ দিতে কর্নওয়ালিস আনলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)। এখানে একটা প্রশ্ন আসা দরকার, আচ্ছা এইসব ঘটনার ভালো-মন্দ নিয়ে কি কেউ কোন লেখালেখি করছেন না। হ্যাঁ করেছেন, খোঁজ নিয়ে দেখা যায় ১৮৩৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' পত্তন করেছিলেন সেখান থেকে প্রকাশিত হতো তত্ত্ববোধিনী মাসিক পত্রিকা। বিদ্যাসাগরের বন্ধু অক্ষয় কুমার দত্ত যখন সেই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তখন তিনি বিদ্যাসাগরকে যুক্ত করলেন পত্রিকার সাথে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের

একটি ধারার মতের সাথে বিদ্যাসাগরের মত ঠিক মিললো না। বিদ্যাসাগর বুঝলেন স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য একেবারে নিজস্ব একটি কাগজ চাই।

বিদ্যাসাগর বাংলার ইতিহাস নামে ইতিহাস বই অনুবাদ করেন সেখানেও তাঁর স্বাধীনতা খাটেনি। তাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ধারাবাহিক লেখায় আমরা দেখতে পাই "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে বাংলাদেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই"। - (বাংলার ইতিহাস) এ কথা ছিল আসলে ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথা। কিন্তু নিজস্ব মত প্রকাশের জন্য বিদ্যাসাগর যখন "সোম প্রকাশ" কাগজে আগ্রহী হলেন তখন এই বন্দোবস্ত নিয়ে অন্য কথা লিখলেন।"চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল জমিদার তালুকদার প্রভৃতির উপকার দর্শিয়াছে। তাহারা নির্বিঘ্নে প্রচুর লাভ করিতেছেন। অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জের যথাসর্বস্ব শোষণ করিয়া ক্রমে তাহাদিগের লোভের বৃদ্ধি হইতেছে"। শুধু এই নয়, সোম প্রকাশে পরপর জমি ও রাজস্ব নিয়ে বারবার সমালোচনা আসতে লাগলো। তখন সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাবিনোদ। সোমপ্রকাশ রাজরোষে পড়ল। এমনকি হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'ও বিপদে পড়েছে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে। হরিশচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর এই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিদ্যাসাগর। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সোমপ্রকাশ লিখেছিল - "গত পহেলা আষাঢ় শুক্রবার বঙ্গভূমি একটি রত্নহারা হইয়াছে- তিনি একাকী নীল প্রধান প্রদেশের প্রজাগণকে রাক্ষস সদৃশ নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন"। এভাবেই বিদ্যাসাগর নানা লেখার মাধ্যমে শোষিত কৃষক সমাজের সঙ্গী হয়েছেন। আর স্বপ্ন দেখেছেন কৃষকরা কবে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। সেই সময় বিদ্যাসাগর কার্মাটার যাতায়াত শুরু করেন। ঠিক পনেরো বছর আগে ১৮৫৫ সালে ওই এলাকার গড়ে উঠেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর অনুধাবন করতে পেরেছিলেন গভর্মেন্টের কৃষি নীতি গরিব মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্ত দিক গ্রাস করে ফেলে। তাঁর পিতামহের গৃহ ত্যাগের কারণও ছিল সেই সময়কার কৃষি রাজস্ব নীতি। একথাও তিনি অন্য প্রবন্ধে নির্দেশ করেছেন।

মৌলিক রচনায় নয়, রচনার মৌলিকতায়
পণ্ডিত বিদ্যাসাগর

শৈবাল ঘোষ

“কালের প্রবাহে ডুবে যায় কতো
নামধাম পরিচয়,
তবু কত প্রাণ রেখে যায় দাবী
মানে নাতো পরাজয়”।

এমনই এক যুগপুরুষ বাঙালী মনের জড়তায় বোধোদয় ঘটালেন, তিনি বাংলা গদ্যচর্চার বিকাশের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক - বিদ্যাসাগর। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকধর্মী গদ্যরচনা, নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ রামমোহনের লেখনীতে হয়ে উঠেছিল যুক্তিনিষ্ঠ, আর সেই প্রয়োজনের গদ্য রচনা, শব্দের লালিত্যের সুষমার সন্ধান পাই বিদ্যাসাগরের সৃজন শৈলীতে। তাঁর অনুবাদমূলক রচনার ভান্ডারেই রয়েছে মৌলিক সাহিত্যকর্মের সম্পদ। বিশেষত বাংলা গদ্য ভাষার সাধু পরিকাঠামোয় তাঁর শিল্পীমনের বোধ, গতিময়তা ও সংযম সঞ্চারিত হয়েছে। সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দুস্থানী ভাষা থেকে তাঁর স্বাধীন ভাষান্তর, কল্পনার বিন্যাস ও উপস্থাপনার মৌলিকত্বে খুঁজে পেয়েছে সুললিত ছন্দ স্রোত।

বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭) হল হিন্দি ভাষার লেখক লাল্লুজি রচিত ‘বেতাল পচ্চীসীর’ অনুবাদ। শিরীষ বৃক্ষে প্রলম্বমান বেতালের নানা প্রশ্ন ও সহজ বুদ্ধিতে রাজা বিক্রমাদিত্যের উত্তর দান হলো গ্রন্থের বিষয়বস্তু, এর ভাষান্তরের ভাষা সাধু গম্ভীর হলেও সরস সাবলীলতায় এবং ধ্বনি রোলের তরঙ্গে তা হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ‘Outlines of the History of Bengal for the use of Youth in India’ গ্রন্থের অবলম্বনে রচনা করেছেন ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ (১৮৪৮)। বিদ্যাসাগরের মৌলিক ও সাবলীল রচনার স্পষ্টতা রয়েছে এই রচনায়। চেম্বার্সের ‘Biographies’ অবলম্বনে ‘জীবনচরিত’ (১৮৪৯) এবং ‘Rudiments of knowledge’ অবলম্বনে রচনা করেন ‘বোধোদয়’ (১৮৫১)। এই সকল গ্রন্থগুলি ছিল উদ্দেশ্যমূলক, যেখানে শিক্ষার্থীদের প্রতি মৌলিক শিক্ষার উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন তাঁর ভাষা শিল্পের প্রয়োগ নৈপুণ্যে। মহাকবি কালিদাসের ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম্’ সংস্কৃত নাটকটি কে সার্থক অনুবাদ করেন তাঁর ‘শকুন্তলা’তে (১৮৫৪)। এটিকে অনুবাদ গ্রন্থ না বলে মূল কাহিনী

আশ্রিত বলা ভালো। রচনা গাম্ভীর্য ও রস আদ্যোপান্ত বজায় রেখে গদ্যে তাঁর প্রবাহমানতা কে বাঙালীর আরো নিকট করে তুলেছেন। এতে তিনি সূত্রধর ও নটীর সংলাপ কাহিনী বাদ দিয়েছেন, অলৌকিতা ও আদিরসকে সংযত করেছেন। আকস্মিকতা ও নাটকীয়তাকে পরিহার করেছেন। বাংলা ভাষার ওপর এই 'শকুন্তলা'র প্রভাব অপরিসীম বলা যায়। বিশেষত নারী চরিত্র গুলির ভাষাকে, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগর অনেকখানি 'তৎসম' প্রভাবমুক্ত করেছেন। ঈশপের গল্প অবলম্বনে 'কথামালা'(১৮৫৬) রচনায় শিশু মনস্তত্ত্ব, পরিবেশ সচেতনতা, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও রসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন, অনুবাদের ভাষাও প্রাঞ্জল এবং সৌকর্যমন্ডিত। বিদ্যাসাগরের সৃষ্টিশীল প্রতিভায় পুরাতন বিষয় নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে তার 'সীতার বনবাস' (১৮৬১)। সংস্কৃতে ভবভূতির 'উত্তর চরিত' ও বাল্মিকী রামায়ণের 'উত্তরকান্ডে'র আখ্যান অনুসারে এই রচনায় ছন্দোবদ্ধ গদ্যের অপূর্ব সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাহিত্যের চরিত্র সৃষ্টির অঙ্কুর উপলব্ধ হয় এই গ্রন্থটিতে। ভাবযতি ও বিরতি চিহ্ন প্রয়োগে বাংলা গদ্য সাহিত্যের গদ্যে উন্নীত হয়েছে। নমুনা প্রসঙ্গে– লক্ষণ বলিলেন, "আর্য! এই সেই জন স্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবনগিরি। এই গিরির শিখর দেশ সতত সঞ্চরমান জলধর মন্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত, অধিত্যম ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপথ সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমনীয়; পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" শেক্সপীয়রের নাট্য কাহিনী 'Comedy of Errors' অনুবাদে রচনা করেছেন 'ভ্রান্তিবিলাস'(১৮৬৯)। এখানে একটি বিদেশি কাহিনীকে, নাটকের পাত্র-পাত্রীর নামধাম, আচার-আচরণ পাল্টে দেশীয় ভাষায় সরস করে তুলেছেন।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়-"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা লিখতে পারে নাই।" রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে- "বাংলা ভাষাকে গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্র সভার উপযোগী আর্যভাষা রূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন"। ছেদ ও যতি চিহ্নের সুষ্ঠু ব্যবহারে তাঁর গদ্য হয়েছে ভাবের অনুসারী। সন্ধি ও সমাসবহুল এবং তৎসম শব্দের সাবলীল প্রয়োগে রচনায় সুর মাধুর্য্য সৃষ্টি হয়েছে। অসমাপিকা ও যুগ্ম ক্রিয়াপদের ব্যবহার ।

বলা যায়, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ কর্ম নিছক আক্ষরিক অনুবাদ বা ভাবানুবাদ নয়, রয়েছে স্বাধীন কল্পনা বিন্যাসের দৃষ্টান্ত ও উপস্থাপনার মৌলিকতা। তাঁর বহু রচনাই মৌলিক রচনা নয়, কিন্তু রচনা মৌলিকত্বে তিনি বাঙালী পাঠকের নিকট হয়েছেন, বাংলা ভাষা সৃজনধর্মতার পথে পথপ্রদর্শক হয়েছে। মানবপ্রেমে

জারিত তাঁর অন্তঃকরণটিও সাহিত্য কর্মের মধ্যে সদা জাগরুক ছিল। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর ভাবনায়- "পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করে অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়"। বিদ্যাসাগরের গদ্যচর্চা ও তার বিকাশ, এই ত্রুটি থেকে অনেকখানি দোষমুক্ত। সাহিত্যকর্মে 'Art for Art Sake'- অর্থাৎ শিল্পের জন্য শিল্প এই মতবাদ তাঁর কাছে প্রাধান্য পায়নি। মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে হয়তো তিনি লেখনি ধারণ করেননি। কিন্তু তাঁর যাবতীয় রচনা বলা যায় 'জনহিতায় জনসেবায়'। লেখনি সঞ্চালনের সময় তাঁর মনন সম্মুখে উদ্ভাসিত থেকেছে সুকুমার মতি শিক্ষার্থীদের "কুন্দসন্নিভ" স্মিতমুখ, প্রভাত সূর্যালোক স্নাত। সংস্কৃত, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অনুবাদ রচনায় মানব জীবনের উপযোগিতা সর্বাগ্রে উদ্ভাসিত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর যুগ থেকে চলে আসা বাংলা কথ্যরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে দু-একটি রচনা ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের মূল ধারা 'বিদ্যাসাগরীয় রীতি'তে অগ্রসর হয়েছে। 'সবুজপত্র' পর্বের পূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রধান বাহন যে 'সাধু গদ্যরীতি' তার মূল রূপকার, বিশ্বকর্মা হলেন বিদ্যাসাগর। আধুনিক গদ্যভাষা চর্চায় তাঁকে 'বর্ণনাত্মক বাংলা সাধু ভাষার জনক' বলা হয়। তাঁর পাণ্ডিত্য, যুক্তি, মনন, বৈদগ্ধ্যগুণে তিনি প্রস্তরভেদী দেবদারু, নবজাগরণ আর সংস্কারে-

জরায় পিড়িত একটা জাতির
গড়িয়েছো মনোরথ,
বইয়ে দিয়েছো পবিত্র ধারা
একালের ভগীরথ।

(সহযোগিতায় -সহায়ক গ্রন্থ)

"তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে তাহার সহিত তুলনা করিলে তোমার অবস্থা অনেক ভালো বোধ হইবেক।"

কার্মাটারের ডায়েরী থেকে

দেবাশীষ মান্না

সূর্য তখন সবেমাত্র দিগ্‌বলয় ফুঁড়ে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদেরকে সতের সিটের ট্রাভেলার গাড়িটা একটি সংকীর্ণ পাকা রাস্তার পাশে ভগ্নপ্রায় প্রাচীরের কাছে থামল। ড্রাইভার এবং আমাদের ট্রাভেল প্লানার জানালেন আমরা কার্মাটার পৌঁছেছি। সারারাত্রি ব্যাপী গাড়ি ভ্রমণের কারণে অনেকে তখন নিদ্রামগ্ন, অনেকের তন্দ্রা ভেঙেছে। কার্মাটার পৌঁছে গেছি জেনে মনটা কেমন যেন অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চে পূর্ণ হয়ে গেল। ভোরের আলোতে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিলাম। ১৮৭৩ সাল। জঙ্গলাকীর্ণ সাঁওতাল পরগণার এই আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে বিদ্যাসাগর তখন ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিষাদগ্রস্ত মনে নতুন প্রাণের হাওয়া যোগানে প্রথম পদার্পন করলেন। এক ব্রিটিশ মহিলার কাছ থেকে নগদ ৫০০ টাকার বিনিময়ে কিনলেন বাড়ি সহ কয়েক একরের বাসযোগ্য একটি জমি। নাম দিলেন 'নন্দনকানন'।

ডাকাডাকিতে ঘোর কাটল। তড়িঘড়ি করে নামলাম গাড়ি থেকে। বাতাসে তখন সমাগত প্রায় শীতের হিমেল পরশ। দলবেঁধে একটি গলি পেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সাদামাটা একটি প্রবেশদ্বারের সামনে। নন্দনকানন, বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবন। ভেতর থেকে তালা বন্ধ লোহার দরজা। খুবই স্বাভাবিক। এত সকালে যেখানে স্বাভাবিক জনজীবনের ছবি এখনো অধরা সেখানে তালাবন্ধ থাকাটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তাই বলে কি এতটা কাছে এসেও বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের প্রায় আঠারো বছর অতিবাহিত করা বারাণসীর মাটি ছুঁয়ে দেখা হবে না! চাক্ষুষ করা যাবে না প্রায় দেড়শ বছর পুরনো তাঁর ব্যবহৃত খাট-পালকি ! চোখ পড়ল গেটের কাছে দেওয়ালের ওপর। লাল-কালো রঙে লেখা 'নন্দনকানন', বিদ্যাসাগর স্মৃতি ভবন' যোগাযোগ- জিতেন্দ্র মন্ডল (কেয়ারটেকার ৮০৮৪৩৯৭৯০১), চন্দন মুখার্জী (জয়েন্ট সেক্রেটারি -৬২০২১৬৫৯৮৯)। আশার আলোয় আনন্দের অনুভূতি। ফোনে জানা গেল মেদিনীপুর থেকে আসা বাঙালী বাবুদের স্বাগত জানাতে জিতেন্দ্র

নিজেই আসছেন অনতিবিলম্বে। ভেতরে ঢুকে জীর্ণতার ছাপ চোখে পড়লেও সাম্প্রতিক অতীতে যে বেশকিছু সংস্কার সাধন হয়েছে তা স্পষ্ট। প্রবেশপথের ডানদিকে বিস্তীর্ণ কলেবর ও সুপ্রাচীন বটগাছের তলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে বসলাম। ওই পথের বামদিকে সদ্য নির্মিত ছোট্ট বিশ্রাম কক্ষ সংলগ্ন ওয়াশরুমে যখন কেউ কেউ ব্যস্ত আমি তখন স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিদ্যাসাগরের ম্লান মর্মর মুখের দিকে। বিহার বাঙালী সমিতির বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা কমিটির সভাপতি পাটনা হাইকোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের অধ্যক্ষ শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এই মর্মর মূর্তি। মূর্তির সামনে ফলকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অমর উচ্চারণ "দয়া নহে বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাহার অজেয় পৌরুষ, তাহার অক্ষয় মনুষত্ব"। মনে হলো প্রকৃত অর্থেই ইনি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অনুভবের বাঙালি নেপোলিয়ন।

হতদরিদ্র আর সংকীর্ণ মানসিকতায় পরিপূর্ণ আত্মীয় পরিজন ও সহকর্মী বন্ধুদের ছেড়ে একান্ত অবসরে মন ও স্বাস্থ্য উদ্ধারের যে আশায় তিনি এসেছিলেন ঘুমন্ত প্রায় এই সাঁওতাল গ্রামে, তা আর তাঁর হল না। আসলে কর্মবীর নেপোলিয়নের জীবনে মৃত্যুর আগে বিশ্রাম বলে কিছু হয় না। সভ্যতার আলো থেকে বহু যোজন দূরে তখনও আঁধার নিমগ্ন এই পরগণার সরল ভালো মানুষগুলোর দারিদ্র, কষ্ট, জ্বরা ও অশিক্ষা তাঁকে আবারও ভাবিয়ে তুলল। নতুন উদ্যমে প্রাণের স্বতস্ফূর্ত আনন্দে শুরু হল বিদ্যাসাগরের নতুন কর্মকাণ্ড। অশিক্ষিত কন্যাদের জন্য বালিকা বিদ্যালয়, বড়দের জন্য নৈশ বিদ্যালয় আর অসুস্থদের জন্য দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় স্থাপন। শুধু মাত্র কয়েক ফোঁটা জীবনদায়ী ঔষধে ক্ষান্ত নয়, সঙ্গে যোগাতেন সাবু, মিশ্রি ও বার্লির মত পথ্যও। ভোর থেকে সকাল ১০ টা পর্যন্ত দাতব্য চিকিৎসালয়, তারপর বাগান পরিচর্যা, বিকেলে আবার পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে সবার ভালো মন্দ, সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর নেওয়া-এ যেন তার নিত্য অভ্যাস হয়েছিল জীবনযাপনের। কলকাতা এলেই ফেরার সময় প্রচুর ফলমূল যেমন খেজুর, কমলালেবু, কাপড়-চোপড়, শীতের পোশাক, কম্বল, রাঙা চিরুনি, তেল, আরসি ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে বিলিয়ে দিতেন গরীব সাঁওতালদের মধ্যে। আর প্রতিদানে সাঁওতালদের জীবন্ত ভগবান উপহার পেতেন তাদের নিজেদের যত্নে ফলানো শাকসবজি, মুরগি, মাছ এবং অবশ্যই সবকিছু ছাপিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ের উন্মুক্ত চওড়া হাসি আর আনন্দ। গরিব-দুঃখীর এই হাসি আর আনন্দপূর্ণ মুখগুলোই ছিল তাঁর অবিশ্রাম পরিশ্রমের প্রেরণা। পিতামাতার কাছ থেকে পাওয়া সহজাত অনমনীয় মনোভাব ও করুণা তো ছিলই।

চমকে উঠলাম ডাক শুনে, কেয়ারটেকার জিতেন্দ্র বাবু এসে ডাকছেন, 'স্যার চলুন, আপনাদের সংগ্রহশালা টা দেখিয়ে নিয়ে আসি।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ চলুন।' যে আবেশ এর মধ্যে ছিলাম বেশি কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না। জিতেন্দ্র খুব যত্ন করে দেখাচ্ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যবহার করা প্রায় দেড়শত বছর পুরনো খাট, চেয়ার, সেখানে রাখা তাঁর অন্য আবক্ষ মূর্তি, অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি, ও অন্য একটা ঘরের দেওয়ালে আঁকা বিদ্যাসাগরের জীবন কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্যাবলী। অবাক হয়ে দেখলাম তাঁরই ব্যবহৃত খাটের উপর একটি শোপিসের মধ্যে তাঁর মুখ অঙ্কিত একটি ঘটের মধ্যে সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখা 'বীরসিংহের মাটি।' ২০১৯ সালে তাঁর জন্মের দ্বিশত বর্ষ উদ্‌যাপনের স্মৃতি উপলক্ষ্যে আসানসোল পৌরনিগমের সৌজন্যে ও আসানসোল প্রেসক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আনিত এই মাটি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য।

জিতেন্দ্র বাবুর কাছে গল্পচ্ছলে যা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হলো তার সারাংশ কিছুটা এইরূপ। এক সময় আর.এস.এস.এর স্থানীয় শাখা তাদের দৈনন্দিন মহড়ার জন্য ভবনের সামনের মাঠটি ব্যবহার করত। জানা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এর মৃত্যুর পর তার ছেলে নারায়ণ চন্দ্র কোন এক ব্যবসায়ীকে বাড়িটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ব্যবসায়ী তখন এখানে উন্নত মানের গোলাপ চাষ করতেন যা বিদেশেও রপ্তানি হতো। দীর্ঘদিন বিস্মৃতির অন্তরালে থাকার পর ১৯৭৪ সালের ২৯ মার্চ বিহার বাঙালি সমিতি বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও জিতেন্দ্র নাথ মল্লিক এর কাছ থেকে নগদ ২৪ হাজার টাকার বিনিময়ে ৩ একর ১৯ ডেসিমেলের এই নন্দনকানন কে কিনে নেন ও পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা কমিটির তত্ত্বাবধানে এটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নন্দনকানন পরিচালনা সমিতির নামে একটি সমিতি গঠন হয়। ১৯৭৪ সালেই কার্মাটার রেল স্টেশনের নাম বদলে বিদ্যাসাগর স্টেশন করা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর ২৯ শে মার্চ অর্থাৎ নন্দনকানন পুনরুদ্ধার দিনটিতেই 'গুরুদক্ষিণা' নামক 'স্মৃতি তর্পণ' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রয়াণ সংবাদ পৌঁছানোর পর কার্মাটারের সাধারণ মানুষের জীবন নাকি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। শোকে মুহ্যমান সাঁওতাল পরগণা তাদের জীবন্ত দেবতা বা ধন্বন্তরি কে হারিয়ে। বিদ্যাসাগরের পর এমন আর কোন মহাপ্রাণের পদচিহ্ন পড়েনি বলেই হয়তো এই অঞ্চল আজও দিশাহীন নয়তো সরকারি স্বীকৃতির ও অর্থের অভাবে বিদ্যাসাগরের মানস বিদ্যালয় গুলি বন্ধ হয়ে যেত না। কিংবা হয়তো এই অঞ্চলে প্রায় ২৪ জন বিধবাকে তৎকালীন যুগে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও সাম্প্রতিক অতীতে এই এলাকার এক

আদিবাসী ছেলেকে এক বিধবাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশের পর নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা হতে হত না।

জেগে উঠুক বাঙালী, জ্বলে উঠুক আগুন প্রত্যেক বাঙালীর অন্তরে অন্তরে। মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের বার্ধক্যের বারাণসী জামতাড়া জেলার কোন অসামাজিক গোষ্ঠী বা সাইবার ক্রাইম ক্রিমিনালদের পিঠস্থান নয়, না হোক কোনো রাজনৈতিক কট্টরপন্থীদের আড্ডাখানা। কার্মাটার হোক প্রতিটি বাঙালীর স্মৃতিবিজড়িত প্রিয় পর্যটন গন্তব্য।

জিতেন্দ্র বাবুর শেষ দিকের আবেগতাড়িত আর হতাশাব্যঞ্জক এই কথাগুলো আমার মনের মধ্যে কি অনুরণন আর শিহরণ সৃষ্টি করেছিল, ভাষা দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে পারবো না হয়তো, কিন্তু মনে থাকবে ওই কথাগুলি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ঠিক মনে নেই কিভাবে সেদিন নন্দনকানন ত্যাগ করে গাড়িতে উঠেছিলাম আর তারপরের কোন কোন দর্শনীয় স্থান সশরীরে পৌঁছেছিলাম!

> সৎকাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায়। আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথা পর্যন্ত বলিয়া সময়ে গালি দিয়াছে যে, আমি চরিত্রহীন বলিয়া অল্পবয়স্ক বিধবাদের বাড়িতে আশ্রয় দেই।

আলোর পথযাত্রী

চৈতন্য চরণ দাস অধিকারী

বই পড়ার অভ্যাসটা আমরা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। বিশেষ করে আমাদের ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ নবীন প্রজন্মের। পাঠ্যসূচির বাইরেতো নয়ই, ইদানিং পাঠ্যবিষয়কে ছোট করে যে গৃহশিক্ষক নিপুণ হাতে পরিবেশন করেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে, বাজারে তার চাহিদা বেশি এর সাথে যুক্ত হয়েছে স্মার্টফোনগুলো। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সব আগ্রহ একে ঘিরে। তবু শারদীয়া আসে, আসে বিদ্যালয়, ক্লাব প্রভৃতি সংগঠনগুলির কিছু কিছু বিশেষ বার্ষিকী, যেখানে পুরানো রীতি মেনে বের হয় স্মরণিকা। তাতে লেখা বের হয় কিন্তু পাঠক পাওয়া যায় কি? জানিনা আমার এই লেখার পাঠক জুটবে কিনা।

ভাবছি কোথা থেকে শুরু করব। জ্ঞান, গরিমা, ত্যাগ, তিতিক্ষায় যিনি সাগর অভিধা পেয়েছেন তার সেই সাগরের বর্ণনা কোথা থেকে কিভাবে শুরু করা যায়। ভাবছিলাম যদি তিনি না জন্মাতেন তাহলে আমাদের বর্ণপরিচয় এর কি হতো। কি হতো আমাদের বাংলা গদ্য সাহিত্যের চেহারা। তিনিতো বাংলা গদ্য সাহিত্যের রূপকার। বর্ণগুলির চেহারা কেমন হবে, সেগুলি দিয়ে শব্দের শরীর কেমন গড়ে উঠবে। কেমন করেই বা শব্দগুলো পাশাপাশি বসে কমা, ছেদ ইত্যাদি নিয়ে মনের ভাব কে স্পষ্ট করে প্রকাশ করবে। "জল পড়ে, পাতা নড়ে পাগলা হাতি মাথা নাড়ে" একই গদ্য, না পদ্য, না একটা ছবি, যা, একটি শিশুর মনের ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলছে এক অপূর্ব দৃশ্যপট। আমাদের শৈশবে কোন সহপাঠীর বর্ণপরিচয় পড়তে বিরক্তি লেগেছে বা আজও লাগে বলে শুনিনি। এমন কোন মহামানব কে কি আমরা দেখেছি যিনি বিদ্যালয় গড়ছেন, বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য শিক্ষক জোগাড় করছেন, তাদের মাইনের ব্যাবস্থা করছেন, ছাত্র-ছাত্রী জোগাড় করছেন, তাদের জন্য বই লিখছেন, সেই বই ছাপছেন, আবার পরিদর্শক হয়ে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা তা বুঝতে ছুটে বেড়াচ্ছেন রাঢ় বাংলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কি অফুরন্ত প্রাণশক্তি ! কি অনমনীয় জেদ! মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় ঠিকই বলেছিলেন, চরিত্রে কর্মোদ্যোগী তিনি ইউরোপীয় আর অন্তরে তিনি বাঙালী মায়ের মত। অপরের দুঃখ কষ্টে এমন বিচলিত হতে, দুখীর জল মুছাতে এমন করে সর্বস্ব-পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাঙালী আর কজন কে দেখেছে? হাভাতেদের মুখে একটু ভাত যোগান, অসহায়দের অবলম্বন হয়ে ওঠা, আবার

রাজপুরুষ ইংরেজদের অন্যায় অভব্য আচরণে তীব্র প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রগণ্য। যদিও তার সময়ে সতীদাহ নামক নারকীয় ব্যবস্থাটি কিছুটা স্তিমিত ছিল কিন্তু বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহের মতো দুষ্ট ক্ষত-বাঙালী হিন্দু সমাজ জীবনে তখন দগদগে। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার, বহুবিবাহ রদ করা, বিধবা বিবাহের প্রচলনে এক অর্থে একচোয়াল চাপা যুদ্ধে নেমে পড়া এবং যুদ্ধ জয় করা বিদ্যাসাগর ছাড়া কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিরোধীদলে কে ছিলেন না। তখন গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী থেকে বেদ-উপনিষদ কপচানো, মাথায় টিকি, কপালে চন্দন কিংবা সিন্দুরের তিলক আঁটানো নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ পুরোহিত, কবি ঈশ্বর গুপ্ত এমনকি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও। কোন বাধাই তাকে থামাতে পারেনি, টলাতে পারেনি তাঁর সংকল্প থেকে। আঘাত পেয়েছেন একেবারেই আপনার কাছের মানুষদের থেকে। আসলে তিনি যেন পুরাণের সেই মহাদেব নীলকণ্ঠ। সমস্ত হলাহল কে নিজের গলায় ধারণ করে একটি সুন্দর সকালের আগমনের স্বপ্ন সফল করতে যুদ্ধে চলেছেন একাই, হ্যাঁ, একাই। শেষ বয়সে কার্মাটারে সাঁওতালদের সাথে কাটিয়েছেন অভিমান ভরা বুক নিয়ে। আমার মনে হয়, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে আহ্বান শুনলাম -"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে", তাকে তিনি পূর্বেই পূর্ণতা দিয়েছেন।

> “আমরা নিম্নশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি। হায় শিক্ষিত শ্রেণীর এতই অহংকার, এতই অভিমান, দেশের শক্তি যাহারা, আশা-ভরসার স্থল যাহারা, তাহাদিগকে মনুষ্যের শ্রেণীতে গণ্য করতেও কুণ্ঠিত হয়।”

একাগ্রতা কর্মশীলতা এবং হৃদয়বত্তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যুগল প্রধান

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি 'বিদ্যাসাগর' নামে খ্যাত তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য, চরিত্রবল, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, করুণায় উদ্বেলিত হৃদয়, পরোপকার, মাতৃভক্তি প্রভৃতি সদগুণের জন্য সর্বজন পূজ্য। কিন্তু অপর একটি বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি তা হল তাঁর অদ্ভুত একাগ্রতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'একাগ্রতা শিক্ষার প্রাণ'। একাগ্রতা ছাড়া আমরা কোন বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে পারি না। আমাদের মন সাধারণত বিভিন্ন বিষয়ে ধাবমান হয় তাই আমরা আমাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে নিতে পারি না। এই বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল মন নিয়ে কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারি না। একজন ছাত্রের পড়াশোনা এবং তার জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য তার মনটিকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নিবিষ্ট হতে হয়। ঈশ্বরচন্দ্র যখন বালকমাত্র তাঁর শেখার আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর শিক্ষক কালীকান্ত বাবু তাঁকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কলকাতা যাওয়ার পথে তিনি মাইলফলক দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখে নেন। কলকাতার বাসাবাড়িতে তাঁকে প্রায়ই নিজের হাতে রান্না করে খাওয়া এবং অন্যদের খাওয়ার পরিবেশন করতে হতো। নিজের ঘরে তখন আলোর ব্যবস্থা ছিল না তাই রাস্তার ধারে ফুটপাতের আলোয় পড়াশোনা করতে হত। এই সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁর বিদ্যার্জনের কৌতুহল কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। তিনি সংস্কৃতসহ আরো অনেকগুলি বিষয়ে অতি অল্প বয়সেই অভূতপূর্ব জ্ঞানার্জন করেন। সেই কারণে সংস্কৃত কলেজ থেকে তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান করা হয়। চরম দারিদ্র্য নানান প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের মূল চাবিকাঠি হল তাঁর মনের অদ্ভুত একাগ্রতা। এ বিষয়ে কিছু ঘটনা অলৌকিক মনে হলেও সত্য। শোনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে বসেছেন, সামনে রাজপথ দিয়ে বিয়ে বাড়ির বাজনা-বাদ্দি বেজে চলে গেছে, ঈশ্বরচন্দ্র সে ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ টের পাননি। তিনি একনিষ্ঠ মনে বিদ্যার্জনে রত ছিলেন। এ ধরনের ঘটনা তাঁর জীবনে প্রায়ই লক্ষ্য করা যেত। তিনি কখনো অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের কথা বা চিন্তা করে কালাতিপাত করেননি। একাগ্রতা লাভের অন্যতম শর্ত হলো

উক্ত বিষয়ের প্রতি গভীর অনুরাগ। ঈশ্বরচন্দ্র একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হয়ে থাকতে পারতেন। বিদ্যাসাগর নামে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তো না, যদি না তাঁর এই প্রকার একাগ্রতা থাকতো। একাগ্রতা লাভের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল শরীর ও মনের পবিত্রতা বজায় রাখা। সেইসঙ্গে চাই পবিত্র এবং সংযত জীবনযাপন। ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে এইসব ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অগাধ নিষ্ঠা এবং গভীর আত্মপ্রত্যয়। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় দু-তিন বছরের পাঠ্য বিষয় তিনি মাত্র ৬ মাসে সম্পূর্ণ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তার জন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। রাত দশটায় ঘুমিয়ে আবার আরমানি গির্জার ঘন্টা শুনে রাত ১২ টায় ঘুম থেকে উঠে সারারাত পড়াশোনা করে তিনি ল-কমিটির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। একাগ্রতার সঙ্গে কর্মশীলতা যুক্ত না হলে জীবনে প্রত্যাশিত সাফল্য অধরাই থেকে যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে এর অপূর্ব মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। শারীরিক গঠনের দিক থেকে উচ্চতায় কম হলেও বিদ্যাসাগর বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে দারিদ্র্যের কারণে পুষ্টিকর খাবার দূরে থাক প্রত্যহ উদরপূর্তির উপযোগী খাবার তাঁর জুটত না। অথচ বাল্যকাল থেকে কঠোর পরিশ্রম তার স্বভাব সিদ্ধ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় সুদূর মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় যাতায়াত সবটাই পায়ে হেঁটেই করতে হতো। সাঁতরে নদী অতিক্রম করার কথাও আমরা শুনেছি। সংস্কৃত কলেজের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ খালি হলে তখনকার দিনের লোভনীয় ৯০ টাকা বেতনের চাকরি তিনি নিজে গ্রহণ না করে তাঁর অভাবগ্রস্ত সুপন্ডিত বন্ধু তারানাথ তর্ক বাচস্পতির নাম সুপারিশ করেন। কিন্তু তিনি তখন কলকাতা থেকে বহুদূরে কালনাতে থাকতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক রাতের মধ্যে ১০০ কিলোমিটারের বেশি পথ হেঁটে তার বাড়িতে গিয়ে তার আবেদনপত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। নিজের বিদ্যার্জন, বাংলা ভাষা পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা, শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপন, সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ রোধ প্রভৃতি কাজে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় এর জীবন থেকে যেমন আমরা একাগ্রতার শিক্ষা নেব তেমনি তাঁর কাছ থেকে কঠোর পরিশ্রমেরও দীক্ষা নিতে হবে। মনের একাগ্রতার সঙ্গে, কর্মকুশলতার সম্মিলনও আমরা আরো অনেকের জীবনে দেখতে পাই কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এর জীবনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাঁর হৃদয়বত্তা। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলেছিলেন তুমি সিদ্ধপুরুষ কারণ আলু পটল সিদ্ধ হলে যেমন নরম হয় তেমনি করুণায় তোমার হৃদয় কোমল হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন তিনিই মহাত্মা যার হৃদয়

অপরের দুঃখে কাঁদে, অন্যথায় দুরাত্মা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর জনপ্রিয় উপাধি হল -'দয়ারসাগর'। দরিদ্র, অসহায়, আর্ত এবং পীড়িতের সেবায় তার হৃদয় সব সময় উদ্বেলিত হয়েছে, তাই তিনি পথ খোঁজার চেষ্টা করেছেন কীভাবে সেই কষ্টের অবসান ঘটানো যায়। সামাজিক অত্যাচারে ক্লীষ্ট বাল বিধবাদের ক্রন্দন ধ্বনিতে বাংলার আকাশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। পাষাণ হৃদয় বিধানদাতা সমাজপতিদের তাতে কোন অসুবিধা না হলেও বিদ্যাসাগরের হৃদয় কে তা বিদীর্ণ করে তোলে। অন্তত উৎসাহ, নিরলস শাস্ত্র পাঠ এবং কঠোর পরিশ্রমে তিনি শাস্ত্রের সমর্থন আবিষ্কার করেন। এবং বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান। আর্ত ও পিড়ীতের সেবায় তিনি শুধু অর্থ ব্যয় করেছেন এমন নয়, নিজের হাতে সেবাও করেছেন। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের ব্যথা তাকে অস্থির করেছে। তাই শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি অক্লান্ত ভাবে কাজ করে গেছেন। সমাজের সব থেকে পিছিয়ে পড়া আদিবাসীদের প্রতি অন্তরের একাত্মবোধ থেকেই শেষ জীবনে কার্মাটারে তাদের কাছেই থাকতে চেয়েছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল এক হৃদয় যা জগতের মানুষের দুঃখ-কষ্টে সহজেই বিচলিত হত, সেইসঙ্গে ছিল চিন্তা এবং পরিকল্পনা করার মতো উন্নত মস্তিষ্ক এবং কাজ করার মত যোগ্য হাত। একজন মানুষের জীবনে সুষম বিকাশের জন্য এই তিনটি দিকেরই সুষম বিকাশ চাই। তাঁর সম্বন্ধে তাই যথার্থ বলা হয় " The Genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man and the heart of a Bengali mother" অর্থাৎ তাঁর ছিল এক জন প্রাচীন ঋষির মতো প্রতিভা এবং প্রজ্ঞা, একজন ইংরেজের মত উৎসাহ এবং বাঙালি মায়ের মত কোমল হৃদয়।

> শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন একদল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

স্বপ্ন দেখায় বিদ্যাসাগর

উত্তম প্রধান

সম্প্রতি কর্নাটকের একটি গ্রাম্য স্কুলের এক শিক্ষকের অবসর গ্রহণের দিন স্কুলের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী সহ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামবাসী যেভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন, সেই চিত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করেছি। বুকটা গর্বে ভরে ওঠে। আজও বিদ্যাসাগর জীবিত আছেন। মানুষের প্রতি, বিশেষত সমাজের ছাত্রদের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বিদ্যাসাগর তাঁর সারা জীবনের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। আজও তাই কর্নাটকের ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বিদ্যাসাগরকে কেউ ভুলিয়ে দিতে পারেনি, পারবেও না। কিন্তু স্বাধীনতার প্রায় ৭৪ বছর পরেও যে স্বপ্ন নিয়ে একদিকে আপোষহীন ধারার বিপ্লবীরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন করেছেন, স্বাধীনতার পর সেই দেশে আজকে সবচেয়ে বেশি অপসংস্কৃতির জোয়ার, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, হানাহানি, সর্বোপরি সংস্কৃতি জগতের এক চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতন। সারা দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যের অধিকাংশ শিক্ষক সমাজকেও এই অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি। নিজে একজন শিক্ষক হয়েও বলছি বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষকতা জীবনে যা যা করেছেন এবং দেখিয়ে গিয়েছেন তার সামান্যতম যদি আজকের শিক্ষক-শিক্ষিকা - শিক্ষাকর্মীরা গ্রহণ করতো তাহলেও সমাজকে রক্ষা করা যেত। সমাজকে যদি রক্ষা করতে হয় একদিকে যেমন শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অপরদিকে যারা শিক্ষা প্রদান করবেন তাদের চরিত্র, মেরুদন্ড আরো শক্ত, আরো উন্নত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু পঙ্কিলতার আবহে আজকে সেই শিক্ষক সমাজও চূড়ান্ত নিকৃষ্ট মানসিকতার সামিল। আজকের সমাজের সকল স্তরে এই মানসিকতা সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে। একদিকে যেমন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকার চুরি দুর্নীতি চলছে অপরদিকে যারা শিক্ষক হওয়ার জন্য অথবা শিক্ষক হয়ে আছেন তাদের অবস্থা কী? কষ্ট হয় যখন অধিকাংশ শিক্ষকেরা মাস পহেলা বেতন হাতে নিয়ে সমস্ত কর্তব্য থেকে উদাসীন থাকেন। এই টাকা যে জনগণের কষ্টার্জিত ট্যাক্সের টাকা তা একবিন্দুও ভাববার সময় পায়না। দীর্ঘ দু-বছরের বেশি করোনা সংক্রমণের কারণে যখন সমস্ত পঠনপাঠন বন্ধ, তখন ছাত্র-ছাত্রীদের দুরবস্থার কথা, অসহায় অবস্থার কথা ভাবছে না। পরিণতি হয়েছে ভয়ঙ্কর। যেটুকু সময় স্কুল

খোলা তাতেও অনেকের অনীহা স্কুলে ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রে । অফিসরুমে দেখা যায় শিক্ষা ছাড়া অন্য আলোচনা। ছাত্রদের মানুষ করব, উন্নত চরিত্রের তৈরি করব, এই জিনিস আর নেই। কোনো রকম ক্লাসে গিয়ে ঘড়ির সময় টুকু ধরে তাও নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে ক্লাসে গিয়ে যেমন তেমন করে পড়িয়ে দিয়ে চলে আসা। তাতেই কষ্ট। এর পর শিক্ষকরা অনলাইনে লটারির টিকিট কিনতে ব্যস্ত, যদি এক রাতেই কোটিপতি হওয়া যায়, তারা ব্যস্ত জায়গা জমির ব্যবসা করতে, ব্যস্ত নিজের ছেলেদেরকে কত ভালো ভালো স্কুলে পড়ানো যায়, তার জন্য খরচের হিসাব কষতে ব্যস্ত, বহু শিক্ষক স্মোকিং, মাদকাসক্তিতে আচ্ছন্ন, বহু শিক্ষকসমাজ অনলাইন গেম, শেয়ার মার্কেট, অনলাইনে ক্রিকেট গেম খেলে, রোজকার এই ধরনের মানসিকতার খপ্পরে পড়ে যাচ্ছে, তখনই বিদ্যাসাগরের কথা বারে বারে মনে হয়। যে জাতীয় শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় চিন্তাকে ব্যাপকভাবে নিয়ে আসা হচ্ছে, সংস্কৃত শিক্ষাকে প্রধান সাবজেক্ট হিসেবে আনা হচ্ছে। যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের লড়াই সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, উন্নত বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে নতুন এক শিক্ষাব্যবস্থা সে ভাববার সময় নেই আজকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের। আজকে শিক্ষকরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পাঁচটি আঙুলে আংটি পরে পাপকে দূর করতে চাইছে। তারা সেই পুরনো দিনের বস্তাপচা চিন্তা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করছে, কপাল তত্ত্বে ভরসা করছে। একবারও ভাবে না, এই সমাজের কুসংস্কার দূর করার জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, নজরুল, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এদের ভূমিকা কী ? জ্যোতিরাও ফুলে, মুন্সী প্রেমচন্দ এদের ভূমিকা কী? স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবীদের ভূমিকা কী ? একবারও ভাবে না। তাই আজকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার সহযোগী রাজ্য সরকার গুলো অতি সহজেই জাতীয় শিক্ষানীতি কে চালু করে দিতে পারছে। আর এই সমাজ বলতে গেলে তা মেনেই নিয়েছে। আগামী দিনে আমাদের চাকরির স্থায়িত্ব টুকু থাকবে না । আগামী দিনে মানুষকে পশু তৈরীর কারখানা করার সুচতুর পরিকল্পনা চলছে। আজকের পিতা-মাতারা শিক্ষক ও সন্তানদের কাছ থেকে মর্যাদাটুকুও পায় না, মাস পহেলা বেতন পাঠালেও তাদের প্রতি যে ব্যবহার, যে সম্পর্ক রাখা উচিত সেটুকুও বিন্দুমাত্র দেখেনা। আমার আমার করতে করতে-আমার সন্তান, তাকে মানুষ করতে হবে, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি এই করতে করতেই একটি চাকরি জীবনকে তারা শেষ করে দিচ্ছে। যে সমাজ থেকে আমি শিক্ষা পাচ্ছি, যে সমাজ থেকে আমি রোজগার করতে পারছি, আজকে তারাই সম্পূর্ণ সমাজ বিমুখ। অনেকেই মনে করেন আমাদের চাকরি যেহেতু স্থায়ী, কোনভাবেই আমাদের চাকরি থেকে ওরা বাতিল করতে পারবে না, ফলে বেতন নির্ধারিত সময়ে পাবো।

তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেক আশার আলো আছে। এখনো বর্তমান

সমাজ ব্যবস্থা সমস্ত শিক্ষকের নৈতিক মেরুদন্ড ভাঙতে পারেনি। বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে তাই তারা বেঁচে থাকতে চায়। তারা বিদ্যাসাগরকে বুকে বহন করে বিভিন্ন সরকারের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়। তাই 'জাতীয় শিক্ষা নীতি'র বিরোধিতা করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষক সমাজ। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় এই শিক্ষক সমাজ। করোনা সংক্রমণের সময় বহু শিক্ষক তাদের বেতনের একটা অংশ তুলে দিয়েছে সমাজের অসহায় মানুষদের কাছে। ঝড়-বিদ্ধস্ত পশ্চিমবাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায়, বন্যা দুর্গত এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে একদল শিক্ষক-শিক্ষিকা। এইসব শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মীদের পাশে পাওয়ার জন্যই তো মানুষ কাঁদে। তাই কর্নাটকের ওই শিক্ষকের জন্য সবাই কাঁদছে।

এজন্যই আজও প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যাসাগরকে পৌঁছে দেওয়া জরুরী। এই পৌঁছানোর দায়িত্ব কোন সরকার করবে না। আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চেষ্টার মধ্য দিয়ে যদি পৌঁছে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বাঁচতে পারি। বিদ্যাসাগরকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারি। তাই আজকে শিক্ষাকে বাঁচাতে এবং শিক্ষক সমাজকে রক্ষা করতে বিদ্যাসাগরের চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। চোখের সামনে ছবিটি শুধু গভীরভাবে দেখলেই আমরা পাল্টে যেতে পারি। আসুন সমস্ত শিক্ষক সমাজের কাছে আহ্বান-সমাজকে বাঁচাতে গেলে আমাদের যদি কাউকে প্রয়োজন হয় তিনি হচ্ছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর সারা জীবনের নানান কর্মপ্রক্রিয়ার ন্যূনতম যদি আমরা অর্জন করতে পারি তাহলে আমরা এই সমাজকে পাল্টে ফেলতে পারি। সেই অর্থে বিদ্যাসাগরের যে মূর্তি আপনারা স্থাপন করছেন তার মধ্য দিয়ে, এলাকাবাসীর সমস্ত মানুষের কাছে, ছাত্রছাত্রীদের কাছে, শিক্ষক সমাজের কাছে বিদ্যাসাগরের জীবন সংগ্রাম পৌঁছে দেবেন এই প্রত্যাশা রাখি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা দিয়ে শেষ করি "বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমে শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে - বিদ্যাসাগর সেই রূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গ সমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদুর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি তাঁর তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুদিতকে ফল দান করিতেন। কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভা-সমিতির ঝিল্লীঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত -পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই-কিন্তু তাঁর মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালী জাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সুক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব।"

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দর্শন ও ধর্মীয় চিন্তা

দিলীপ কুমার সেনাপতি

বাঙালির হৃদয়ে বিদ্যাসাগর নামটি আজও অনন্য ও বিস্ময়কর। চাল নেই, ধন কৌলিন্য নেই, মাসিক ছয় টাকা বেতনের সওদাগর অফিসের এক কেরানির ছেলে প্রধানত সংস্কৃত শিক্ষার পুঁজি ও ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান নিয়ে সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি আন্দোলনের শীর্ষে আরোহন করলেন। হিমালয় সদৃশ্য মস্তক পুরুষ হিসেবে বাঙালী জাতির প্রকৃত জনকের মর্যাদা পেলেন এ এক বিরলতম ঘটনা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরের ছেলে শাস্ত্রীয় শিক্ষাকে সরল করে কিভাবে শ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমী, নিরীশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী সমাজ সংস্কারক হয়ে উঠলেন তা এখনও গবেষণার অপেক্ষায়। এখন প্রশ্ন হলো বিদ্যাসাগর কি নাস্তিক ছিলেন? প্রশ্নটি বার বার কখনো সমাজ সচেতনতামূলক আলোচনা কিংবা জাতীয়তাবাদী আলোচনাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এর প্রসঙ্গ এলেই ফিরে ফিরে আসে। ভাববাদী দর্শনের কুৎসিত বিষ, ধর্মীয় উন্মাদনা যেভাবে আমাদের চৌকাঠ থেকে খিড়কিতে উঁকি মারছে তখন মনে হচ্ছে একবার অন্তত এই লগ্নে বিদ্যাসাগরের নাস্তিক ও যৌক্তিক দিকটা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞান সক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিস্পৃহ মনোভাব, শ্রীরামকৃষ্ণ কোনোভাবেই বিদ্যাসাগরের মুখ থেকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন স্থির বিশ্বাস বা ভক্তির একটি কথাও আদায় করতে পারেননি, যতদূর জানা যায় তিনি কোন ধর্মযাজকদের কাছে ঘেঁসেননি, মন্দিরে যাননি, পূজা-আর্চনা, জপ-তপও করতেন না। কিন্তু তিনি মানবতায় উদ্বুদ্ধ দয়ার সাগর। অতসব সত্বেও স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতা কে বলেছেন "শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই, তাঁর গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" অত্যন্ত সখেদে বিদ্যাসাগর কালজয়ী কয়েকটা মন্তব্য করেছিলেন তার মধ্যে একটি হলো- "দেশের লোক কোন শাস্ত্র মানিয়া চলে না, লোকাচার ইহাদের ধর্ম" - আজীবন এই ছিল বিদ্যাসাগর এর ধারণা। তাই তিনি লোকাচার স্বরূপ কুসংস্কার থেকে ধর্মকে মুক্ত করতে গিয়ে সংশয়বাদী হয়ে ওঠেন। উত্তরকালে যুক্তিবাদীদের জন্য তিনি এক মহামন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন তা যুগে যুগে যুক্তির আকাশে ধ্রুবতারার মত জ্বলজ্বল করবে। উক্তি ছিল , "ধর্ম যে কি তা মানুষের জ্ঞানের অতীত এবং বর্তমান অবস্থায় ইহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই"। বিদ্যাসাগর ধর্মভাবনা সম্পর্কে তাঁর জীবনীকাদের মধ্যে একজন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একস্থানে উল্লেখ

করেছেন, "তাহার নিত্য জীবনের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন অবস্থান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না"। অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের পরিচয় কখনো পাওয়া যায় নাই। ২২ শে জানুয়ারি, ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। শিক্ষাকে তিনি জাত ধর্মের আবদ্ধে বেঁধে রাখতে চাননি। সেই জন্যই ১৮৫১ সালের ২৮ শে মার্চ ভারত সরকারের শিক্ষাসচিবকে লেখা এক চিঠিতে তিনি হিন্দু কলেজে অব্রাহ্মণ হিন্দুদের পাঠাধিকার দানের সুপারিশ করেন। পরে সুবর্ণ বণিক সমাজভুক্ত ছাত্রদের পাঠাধিকার নিয়ে তিনি সরব হন। সংস্কৃত কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করার পরেও বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা সংস্কারের কাজে হাত দেন। শিশুশিক্ষার কাজে হাত দিয়ে তিনি গ্রামবাংলায় ১০১ টি পাঠশালা তৈরীর কাজে হাত দেন। অনুভব করেছিলেন শিশুদের পাঠ উপযোগী পুস্তকের অভাব। তাই তিনি বিভিন্ন পুস্তকের রচনা করলেন। "সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা" র প্রথম সংখ্যায় "বাল্য বিবাহের দোষ" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই প্রথার কুফল নিয়ে বিভিন্ন সভা সমিতিতে আলোচনায় তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের লেখা দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই লেখাটি সমাজ সংস্কারমূলক প্রথম লেখা, এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বার বার শাস্ত্রের দোহাই দিলেও বাল্যবিবাহ যে অতিশয় নির্দয় ও নীচ কর্ম তার জন্য বিদ্যাসাগরকে কোন শাস্ত্রের দোহাই দিতে হয়নি। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রমের ছাত্রদের গণিত শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। শাসকের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে বিজ্ঞান জয়যাত্রা অব্যাহত রাখবেই এই প্রত্যয় তার মনে ছিল বলেই তিনি কোপার্নিকাস এর জীবনী বাংলায় রচনা করেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মধ্যে দেখেছেন প্রাচীন ঋষির প্রতিভা আর প্রজ্ঞা একজন ইংরেজ সুলভ কর্মশক্তি, আর এক বাঙালী মায়ের মত হৃদয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন সংস্কারমুক্ত ও গতানুগতিকতা বর্জিত আধুনিক দৃষ্টির মানুষ লোকহিত ও মানব সেবাই ছিল তাঁর জীবনের ধর্ম। বিদ্যাসাগর অবশ্যই মুক্তমনা ছিলেন কিন্তু তিনি কখনোই ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না, ছিলেন না উগ্র কিংবা জ্ঞানপাপীদের মত ভ্রষ্ট তাঁর ধর্ম বিশ্বাস আধ্যাত্মিক চেতনা মানুষের কল্যাণে নিবেদিত ছিল। সমাজের অসঙ্গতি কে তুলে ধরেছিলেন সঠিক যুক্তির আলোকে প্রবঞ্চনার আলোকে শুধু তুলে ধরে ক্ষান্ত হননি বাস্তবে সমাজের দৈন্যদশা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন।

রসের সাগর

পার্থ সারথী দাস

রত্নগর্ভা বাংলা-মা যুগে যুগে বহু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই মহান রত্ন নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত মহাকাশে সর্বাধিক ঔজ্জ্বল্যময় জ্যোতিষ্ক। মধুকবি যথার্থই লিখেছেন -

" বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু "

মাইকেলের এই পঙতি কোনও অতিরঞ্জিত উচ্ছ্বাস নয়। বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থে বাংলা তথা সমগ্র বিশ্বের গর্ব। শাস্ত্রীয় অচলায়তনে এবং ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার চাপে যখন নাভিশ্বাস উঠেছিল সমগ্র সমাজে, তখন সেই অশিক্ষা এবং অযৌক্তিক কুসংস্কারের বেড়াজাল দূর করার শপথ নিয়ে যিনি দুর্বার পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ আধুনিক বাঙালি-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয় এমন এক কঠিন সময়ে আবির্ভূত হলেন যখন শিক্ষিত বাঙালী তার চরিত্রবল হারিয়েছে, আপামর বাঙালী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, নারীজাতির মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠীত। এমনই এক গভীর কুহেলিকাময় জীবনে মানবতার বাণী শোনালেন বিদ্যাসাগর। বিখ্যাত পণ্ডিত ও প্রবন্ধকার রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যার মহত্তের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছিলেন- " তিনি ছিলেন বৃহৎ জিনিসকে ক্ষুদ্র দেখাইবার যন্ত্রস্বরূপ।"

বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন অসংখ্য মহতি কর্মে ভরা যার মুল্যায়ন করার শক্তি বা সাহস কোনও সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কর্মময় জীবনে তাঁর মুল ধারাটি হল- "জীবনের মূল্য আয়ুতে নয়, কল্যাণপূত কর্মে"। সমাজ সংস্কারক, নারী শিক্ষার প্রসারক, গদ্য সাহিত্যের জনক, শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূত, দয়ারসাগর ইত্যাদি অজস্র ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়ে আধুনিক বাংলার সূচনা করেছিলেন। এইসব বিষয়ে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ও বিদ্যজন তাদের লেখায় তাঁর ওপর আলোকপাত করেছেন। এখানে আমরা তাঁর জীবনের একটু অন্যদিকে ও অপেক্ষাকৃত লঘু বিষয়ে আলোকপাত করব। বাহিরে বজ্রকঠিন এই মানুষটির অন্তর ছিল কুসুমের ন্যায় কোমল। শুষ্ক আবরণের মধ্যেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট রসিক মানুষ। তাই বিদ্যার সাথে সাথে তিনি ছিলেন রসের সাগর। এখানে তাঁর জীবনের কয়েকটি ছোট ছোট কৌতুকপূর্ণ ঘটনা আমরা জানব। প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যাক্তির জীবনেই বেশ কয়েকটি

মজার ঘটনা থাকে, যেগুলি খুবই মজার এবং হাস্যউদ্দীপক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই চলুন জেনে নেওয়া যাক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের সেরকম কয়েকটি মজার ঘটনা।

বাল্যকাল থেকেই রসিকতার সুযোগ পেলে, সে সুযোগ হেলায় হারাতেন না। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ক্লাসে ঢুকেই ছাত্রদের বললেন, "গোপালয়ে নমোহস্তু মে" বাক্যটি দিয়ে চতুর্থ চরণ একটি শ্লোক রচনা করতে। বিদ্যাসাগর বাক্যটি শুনেই রসিকতা করে বললেন, এক গোপাল (অর্থাৎ অধ্যাপক) তো দেখছি আমাদের সামনেই রয়েছেন, আর এক গোপাল বহুকাল আগে বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন। কোন গোপালের বর্ণনা করব? ছাত্রের এই বুদ্ধিদীপ্ত সঙ্গত প্রশ্ন শুনে অধ্যাপক জয়গোপাল খুশি হলেন। হেসে বললেন, বেশ বৎস, আপাতত বৃন্দাবনের গোপালেরই বর্ণনা কর। ছাত্রাবস্থায় এরূপ বুদ্ধিমত্তা পূর্ণ রসিকতা কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষেই সম্ভব।

আর একবার ওই একই অধ্যাপক সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ছাত্রদের একটি শ্লোক লিখতে বললেন। বিদ্যাসাগর লিখলেন-

"লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলিপি সন্দেশ গজা বিরাজিতাম
যস্যাঃ প্রসাদনে, ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম"।

একবার এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় শখ ছিল বই পড়া এবং সেগুলো যত্ন করে বাঁধাই করে রাখা। এ কাজে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করতেন। ভদ্রলোক বইগুলো দেখে বললেন, এত খরচ করে বইগুলো বাঁধিয়ে না রাখলেও হতো।

-কেন? এতে দোষ কী?

-ঐ টাকায় অনেকের উপকার হতে পারত।

বিদ্যাসাগর তামাক খেতে খেতে ভদ্রলোকের গায়ের শাল লক্ষ্য করে বললেন, আপনার শালটি চমৎকার! কোত্থেকে কত দিয়ে কিনেছেন? শালের প্রশংসা শুনে ভদ্রলোক উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, শালটি পঁচিশ টাকায় খরিদ করা। বিদ্যাসাগর সুযোগ পেয়ে বললেন, পাঁচ সিকের কম্বলেও তো শীত কাটে, তবে এত টাকার শালের প্রয়োজন কী? এ টাকায় তো অনেকের উপকার হতে পারত। ভদ্র লোকটি আর কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার গ্রামের এক প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছেন। সেখানে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে খেতে বসে

রান্নার বিশেষ প্রশংসা করতে লাগলেন। সে সময় ঐ গ্রামেরই এক ধনী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও পরদিন বিদ্যাসাগরকে নিমন্ত্রণ করে নানারকম চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সহকারে আপ্যায়ন করলেন। বিদ্যাসাগর খাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু রান্নার প্রশংসা করছেন না দেখে হতাশ ধনী গৃহকর্তা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রান্না কেমন হয়েছে? ভালো হয়েছে তো?

-ভালোই তবে ময়ান কম হয়েছে।

ভদ্রলোক অবাক, কিসের ময়ান?

বিদ্যাসাগর মুচকি হেসে বললেন, মনের ময়ান। অর্থাৎ তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে গতকাল ওই গৃহস্থের নিমন্ত্রণে আন্তরিকতা ছিল কিন্তু আজ ওই ধনী ব্যক্তি নিমন্ত্রণের মাধ্যমে তার নিজের বড়াই জাহির করছেন মাত্র।

বিদ্যাসাগর খদ্দরের চাদর পরতেন। শীত বা গ্রীষ্ম যাই হোক না কেন গায়ে শুধু চাদর আর কাঠের খড়ম পরেই সংস্কৃত কলেজে ক্লাস নিতে যেতেন। মাঘ মাসের শীতের সময় প্রতিদিন সকালে এভাবে ঈশ্বরচন্দ্রকে ক্লাস নিতে যেতে দেখে প্রায়ই হিন্দু কলেজের এক ইংরেজ সাহেব যাওয়ার পথে বিদ্যাসাগরকে ক্ষ্যাপানোর জন্য বলতেন, "কি হে, বিদ্যার সাগর, বিদ্যার ভারে বুঝি ঠান্ডা লাগে না তোমার?" বিদ্যাসাগর প্রতিদিন কথা শুনতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না। একদিন শীতের সকালে ঠিক একইভাবে তিনি ক্লাস নিতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবার সেই ইংরেজের সাথে দেখা। আবার সেই একই প্রশ্ন। এবার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র তার ট্যাঁক থেকে একটা কয়েন বের করে বললেন, "এই যে গুঁজে রেখেছি, পয়সার গরমে আর ঠান্ডা লাগেনা। এবার হলো তো?"

এক বিয়ে বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দেখা হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরের পায়ে যথারীতি সেই তালতলার শুঁড়তোলা চটি। বঙ্কিমচন্দ্র তাই দেখে ঠাট্টা করে বললেন, মহাশয় আপনার চটির শুঁড় তো বেঁকে ক্রমশ ওপর দিকে উঠছে। শেষ পর্যন্ত আকাশে গিয়ে না ঠেকে! জবাবে বিদ্যাসাগর হেসে বললেন কী আর করা যাবে বলো ! জানোই তো, চটি যত পুরনো হয় ততই বঙ্কিম হয়ে উঠতে থাকে। মুখের মতো জবাব পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেলো।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের আর্থিক অনটনের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাকে নিয়মিত টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন। একদিন এক মাতাল মদ কেনার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য চাইতে এলে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, আমি কোনো মাতালকে সাহায্য করি না। তখন মাতাল বলল কিন্তু আপনি তো মধুসূদনকে সাহায্য করেন। তিনিও তো মদ্যপান করেন। জবাবে বিদ্যাসাগর বললেন ঠিক আছে, তুমি ওর মতো 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখে আনো। তোমাকেও সাহায্য করব। মাতাল উপযুক্ত জবাব পেয়ে চলে গেলো।

একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ দেখা করতে এসেছেন। সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের কেউই এই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন না। এই ব্যবহারে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। অপমানের জ্বালা মেটাতে উপস্থিতদের লক্ষ্য করে বললেন, এইসব অর্বাচীনদের মনে রাখা উচিত যে, ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ। এক সময় তারা দেশ ও ধর্মের কল্যাণ সাধন করেছেন। তারা সব সময় সকলের প্রণম্য । একথা শুনে বিদ্যাসাগর মহাশয় হেসে বললেন, পণ্ডিত মশাই, শ্রীকৃষ্ণ একদিন বরাহরূপ (শূকর) অবতার ধরেছিলেন। তাহলে আপনার কি মত যে ডোমপাড়ায় যত শূকর আছে, তাদের প্রণাম করতে হবে? গোঁড়া ব্রাহ্মণ উপযুক্ত জবাব পেয়ে রাগে গজগজ করতে করতে স্থান ত্যাগ করলেন।

বিদ্যাসাগর মশায় নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন। খুবই অতিথি বৎসল ছিলেন তিনি। একবার খেতে বসে এক অতিথি বারবার থালার উপর হাত নেড়ে আর খেতে পারবেন না বলে মিনতি করছিলেন। এতে বিদ্যাসাগর মশাই পরিবেশনকারিকে বললেন-"হু হু দেয়ং, হাঁ হাঁ দেয়ং, দেয়ঞ্চ করকম্পনে, শিরসি চালনে দেয়াং, ন দেয়ং ব্যঘ্রঝম্পনে"। অর্থাৎ খেতে বসে হু হু করলেও দেবে, হাঁ হাঁ করলেও দেবে, মাথা নেড়ে না বললেও দেবে কিন্তু বাঘ যেমন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেভাবে কোন ব্যাক্তি যদি তার খাবার থালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না বলে তখন তাকে আর দেবে না।

বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাই তার কোনো নিন্দা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একবার এক ভদ্রলোক বঙ্কিমের নিন্দা করছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। তিনি বঙ্কিমের চরিত্র সম্পর্কে খারাপ কথা বলছেন। বলছেন কী কদর্যভাবে রাত কাটান বঙ্কিম। ইঙ্গিত খুবই নোংরা। এসব শুনে বিদ্যাসাগর বললেন বলো কী? সারাদিন এত বড় সরকারি দায়িত্ব (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) পালন করেও এভাবে রাত কাটায়, তাহলে লেখে কখন! আমার তো একটা সেলফ তাঁর বইয়ে ভরে গেল। যাই বল তোমার কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল।

বিদ্যাসাগরের নিজের হাঁপানি রোগ ছিল। শীতকালে সেই রোগ খুব বেড়ে যেত। তিনি সকালে সন্ধ্যায় দু-বেলা গরম চা পান করতেন। একদিন চা খাওয়ার পর অনুভব করলেন হাঁপানির টান যেন একটু বেশি মাত্রায় কম বোধ হচ্ছে। চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন চায়ে আদা বা বিশেষ কিছু দেওয়া হয়েছিল কিনা। চাকর বলে, না রোজ যেভাবে বানাই, সেভাবেই বানিয়েছি। বিদ্যাসাগরের সন্দেহ হয়। সরেজমিনে বিষয়টা খতিয়ে দেখতে রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের কেটলি খোলেন তিনি। যা দেখেন তাতে হতভম্ব বিদ্যাসাগর। কেটলিতে দুটো আরশোলা মরে পড়ে আছে।

তিনি দেখলেন এক কেটলি জলে দুটো আরশোলা পড়ে তার হাঁপ অর্ধেক কমে গেছে। তখন তিনি বেশ কয়েকটি আরশোলাকে গরম জলে সিদ্ধ করে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে হোমিওপ্যাথি মতে ওষুধ তৈরী করলেন। পরে সেই ওষুধ অনেক হাঁপানি রোগীকে তাদের অজান্তে খাইয়ে তাদের রোগ ভালো করেছেন। হোমিওপ্যাথির ওই ওষুধ তৈরি করে অনেকের কষ্ট উপশম করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের বিয়ে হয়েছিল মাত্র পনের বছর বয়সে। তো, সেকালে বাসরঘরে একটা মজার খেলা ছিল, সেখানে অনেকগুলো মেয়ের মধ্য থেকে নিজের সদ্য বিয়ে করা বউটিকে খুঁজে নিতে হত। না পারলে ভীষণ শাস্তি সমবেত কানমলা! বিদ্যাসাগর বাসর ঘরে ঢুকে বউ আর চিনতে পারেন না। ছাদনাতলায় এক পলকের একটু দেখায় কোনরকমে শুভদৃষ্টি হয়েছে। লজ্জায় ভালো করে তাকাতেই পারেননি, দেখা তো কোন ছার। সেই এক পলকের দেখা না-দেখায় চেনা যায় নাকি ! এইরকম অবস্থায় বিদ্যাসাগরের মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল, তিনি করলেন কি, একটা টুকটুকে সুন্দর মেয়েকে ধরে বললেন, এই হল আমার বউ! আর যায় কোথায়, বাসরঘরে মারাত্মক হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। টুকটুকে মেয়েটি যত বলে, আমি আপনার বউ না, আর কেউ। বিদ্যাসাগরমশাই ততই বলেন, উঁহু, আমি ঠিক চিনেছি তুমিই আমার বউ। মেয়েটি হ্যাঁচকা টানে হাত ছাড়াতে চায়, কিন্তু নাছোড়বান্দা ঈশ্বর তার হাত এমন শক্ত করে ধরেছেন যে কিছুতেই আর ছাড়াতে পারে না। শেষে কেঁদেকেটে হার মেনে মেয়েরা বলে যে, ওকে ছেড়ে দাও, তোমার কানমলা শাস্তি বাতিল, আমরাই তোমার বউকে খুঁজে বের করে দিচ্ছি। তারপর নববধূ দীনময়ী দেবীকে যখন তারা ভেতরের ঘর থেকে বের করে আনল তখন বিদ্যাসাগরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল মেয়েটি। হাসিতে ফেটে পড়ল গোটা বাসর ঘর।

পরম পূজনীয় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাত এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কলকাতার বাদুড়বাগানে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দেখা করে রামকৃষ্ণ কৌতুক করে বললেন, " নদী নালা সব পেরিয়ে আজ সাগরে এসে মিললাম"। বিদ্যাসাগর প্রত্যুত্তরে বললেন, "তবে সাগরের নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান"। তখন শ্রী রামকৃষ্ণ বললেন, "না গো না! নোনা জল কেনো গো? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নয়, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র!"

যাইহোক এইরকম বহু মজার ঘটনায় পূর্ণ তাঁর জীবন। মহান এই মানুষটির প্রতি জানাই অসংখ্য প্রণাম। শেষ করব কবির কথায়, সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন-

" সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে আবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার!
কোথাও তবু নোয়ওনি শির জীবনে একবার"।

৩য় পর্ব

এই পর্বে
রয়েছে নাটক
উইলের নকল
রচনাপঞ্জী
জীবনপঞ্জী
ইত্যাদি

নাটক

চেনা অচেনা ঈশ্বর

ভূষণ চন্দ্র মণ্ডল

পুরুষ চরিত্র

ঠাকুরদাস - ঈশ্বরের বাবা
ঈশ্বর
ভবতোষ - ঠাকুরদাসের সহকর্মী
বিমল - জনৈক ব্যক্তি
বুবুন - ঐ ছেলে
রাখাল
সুপ্রকাশ - ঈশ্বরের বন্ধু
ডাক্তার
গুরুমশাই
হরিহর - ঈশ্বরের প্রতিবেশী
গদাধর - ঐ
দুলাল
গোপাল - গ্রাম্য ছেলে

স্ত্রী চরিত্র

ভগবতী - ঈশ্বরের মা
বাসন্তী - ভগবতীর পিসিমা
রাখালের মা
তিন জন প্রতিবেশীনী
দুর্গাদেবী - ঈশ্বরের ঠাকুমা

প্রথম দৃশ্য

স্টেজের একধারে একটি উনুন। হাড়ি, কড়া, খুন্তি, কিছু থালা, গ্লাস, একটা প্লেট, ছোট চৌকির ওপর সাজানো। তারই এক পাশে একটি পিড়ির উপরে জলের কলসি। ওই ঘরের একটা জারের মধ্যে রয়েছে কিছু মিষ্টি। একটা আলনাতে সাজানো আছে কিছু জামাকাপড়। আর দুটো ওড়নী ও চাদর। একটা ছোট টুল থাকবে ঘরের কোনে। ঈশ্বর-প্রথমে ছোট পাঁচি কাপড় ও গামছা গায়। ভবতোষ-ধুতি ও শার্ট , ঠাকুরদাস-সাধারণ ধুতি, সাদা ফতুয়া অথবা গেঞ্জি ওড়নী। ঘরের মধ্যে ঈশ্বর জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলো। এই সময় ভবতোষ ঘরের বাইরে ডাকিতে থাকিবেন-ঠাকুরদাস বাড়িতে আছ-এই বলে দরজায় নাড়া দিবেন। সেই সময়-

ভবতোষ- [প্রণাম করে ঈশ্বর] থাক বাবা থাক, বড়ো হও, মানুষের মত মানুষ হও। [দু'হাত তুলে ধরে ঈশ্বরকে] একি ? তুমি ভিজে কাপড়ে কি করছিলে?

ঈশ্বর- আমি রান্না করছিলাম কাকাবাবু।

ভবতোষ - তা, ভিজে কাপড়ে পরে রান্না করছিলে কেন?

ঈশ্বর - আজ সন্ধ্যায় স্নান সেরে বাজার করে ফিরতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। বাবা আজ একটু তাড়াতাড়ি কাজে বেরোবেন, তাই-

ভবতোষ- তুমি কি প্রত্যহ বাজার করো?

ঈশ্বর - হ্যাঁ, এ কাজগুলি আমিই করি।

ভবতোষ- তাহলে পড়াশোনা কখন করো?

ঈশ্বর- প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়ি, তারপর খেয়ে সবকিছু গুছিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। আবার ভোর ৩ টা থেকে উঠে পড়ি।

ভবতোষ- রাতে রান্না কে করে?

ঈশ্বর- কেন, আমি করি। মাঝে মধ্যে বাবার সময় থাকলে একটু সাহায্য করেন।

ভবতোষ- থালা-বাসন, হাঁড়ি-কড়া এসব কে পরিষ্কার করে?

ঈশ্বর- এগুলো আমিই করি, বাবাকে করতে দিই না।

ভবতোষ- এই ন'বছর বয়সে তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছ ঈশ্বর। তোমার মত একটি ছেলে যদি আমাদের ঘরে থাকতো। তোমাকে আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি বাবা, তুমি খুব বড় হবে। [আদর করে ধরে মাথায় হাত বোলায়] যাও বাবা তোমার রান্না দেখে এসো, আর ভিজে কাপড়টা তাড়াতাড়ি ছেড়ে ফেলো।

ঈশ্বর- আমার রান্না হয়ে গেছে কাকাবাবু।

ভবতোষ- কী রান্না করেছ ?

ঈশ্বর- আলু কাঁচকলাভাতে আর ডাল।

ভবতোষ- বাঃ! তাহলে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে এসো বাবা।

ঈশ্বর- হ্যাঁ, যাচ্ছি। তখন থেকে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি বসুন। [টুলটা এগিয়ে দেয়। ভবতোষবাবু বসে পড়েন।]
আমি ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসছি কাকাবাবু। বাবা এখনি এসে পড়বেন। [ঈশ্বর বেরিয়ে যায়। ঠাকুরদাস প্রবেশ করেন।]

ঠাকুরদাস- কি ভাই ভবতোষ, কখন এসেছ?

ভবতোষ- এই কিছুক্ষণ হলো? [উঠে দাঁড়ায়]

ঠাকুরদাস- আরে বসো বসো। তা বেশ কী মনে করে?

ভবতোষ- একটি সুখবর তোমাকে দিতে এসেছি দাদা।

ঠাকুরদাস- কী সে সুখবর ভাই?

ভবতোষ- মালিকপক্ষ তোমার কাজে খুশি হয়ে মাসিক দু টাকা বেতনের পরিবর্তে,এ মাস থেকে তোমাকে পাঁচ টাকা বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে। আর আমারও বেতন তিন টাকা থেকে বেড়ে চার টাকা হয়েছে।

ঠাকুরদাস- সত্যি ভাই, তুমি একটা মস্ত বড় সুখবর এনেছ। দু-টাকা বেতন পেয়ে সংসার চালাতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। ঘরে পাঁচ-ছয় জনের সংসার, এখানে বাপবেটা থাকি, এই দুই জায়গার খরচ দু-টাকাতে চালানো ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এই জন্য বাড়তি কিছু করতে হচ্ছিল। এবার আর আমার কোন কষ্ট থাকবে না। তা ভাই তুমি যখন আমাকে সুখবরটা দিলে, তোমাকে একটু মিষ্টিমুখ না করে ছাড়ছি না। ঈশ্বর, বাবা শুনে যাও তো। [ঈশ্বর একটা পাঁচি-কাপড় ও ফতুয়া গায়ে দিয়ে প্রবেশ করে]

ঈশ্বর- আমাকে ডাকছেন বাবা।

ঠাকুরদাস- হ্যাঁ শোন, গতকাল যে সন্দেশ কিনে এনেছিলাম, তার দুখানা তোমার কাকাবাবুকে দাও তো।

ঈশ্বর- আমি এক্ষুনি আসছি বাবা। [ঈশ্বর একটু পরেই ছোট রেকাবীতে দুটো সন্দেশ আর এক গ্লাস জল নিয়ে ঢুকে ভবতোষ বাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে, জল গ্লাস নিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকে ঈশ্বর।]

ভবতোষ- [খেতে খেতে] তা জানো দাদা, ঈশ্বরের মত আর ছেলে হয় না।

ঠাকুরদাস- সে তোমরা অত্যধিক স্নেহ কর বলে। হ্যাঁ, তোমাকেও একটা সুখবর জানাচ্ছি ভাই।

ভবতোষ- কী সে সুখবর?

ঠাকুরদাস- জানো ভাই, আজ দুই মাস হল ঈশ্বর ৫ টাকা করে মাসিক বৃত্তি পাচ্ছে পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য। আর কলেজ কর্তৃপক্ষ ওর আচরণেও খুব খুশি হয়েছেন।

ভবতোষ- [ঈশ্বরকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করেন, আর আশীর্বাদ করে বলেন] আশীর্বাদ করি তুমি একদিন প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে। এদেশের সেরা বিদ্বান হয়ে উঠবে। [ঈশ্বর ছাড়া পেয়ে, বাবা ও ভবতোষকে প্রণাম করে ধীর পায়ে বেরিয়ে যায়]

ঠাকুরদাস- সত্যি ভাই, ঈশ্বরকে সন্তানরূপে পেয়েছি। ছেলেটা আমার কষ্ট বোঝে। পয়সা দিয়ে সময়মতো প্রয়োজনীয় কেরোসিন তেল কিনে দিতে পারি না, তাই ও অনেকদিন সন্ধ্যার সময় রাস্তার ধারে ল্যাম্পপোস্টের গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করে। আবার কখনও কখনও রান্নার সময় উনুনের আলোতে পড়াশোনা করে।

ভবতোষ- সত্যি দাদা, ঈশ্বরের কথা যতই শুনছি ততই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সংসারে এমন ছেলেও আছে?

ঠাকুরদাস- ছেলের পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় তেল কিনে দিতে পারি না, এ জ্বালা যে কত বড় তা তোমাকে কি বলে বোঝাবো ভাই। আর আমার এই অসহায়তার কথা ভেবে ছেলে আমার কলেজ থেকে ফিরে জামা কাপড় বদলে নিয়ে রান্নার কাজে লেগে যায়। সন্ধ্যে হওয়ার আগে রান্নার কাজ শেষ করে সব গুছিয়ে রেখে পড়তে বসে যায়। বাড়ি ফিরতে আমার প্রায় রাত ন'টারও অধিক হয়ে যায়।

ভবতোষ- এই রাত পর্যন্ত ঈশ্বর একা থাকে বাড়িতে?

ঠাকুরদাস- এ ছাড়া আর উপায় কি আছে ভাই, বাড়ি ফিরলেই ঈশ্বর হাত মুখ ধোয়ার জল এগিয়ে দেয়। তারপর ও খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে ফেলে। খাওয়ার শেষে ও একাই সব ধুয়ে মুছে গুছিয়ে রেখে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে। যেদিন বেশি পড়া থাকে সেদিন আমাকে বলে দেয় গির্জার ঘড়িতে ১২ টার ঘন্টা বাজলে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি তাই বিছানায় শুয়ে কিছু পড়াশোনা করি। হিসেব নিকেশের কাজগুলো করি। এরপর গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজলে ঈশ্বরকে পড়বার জন্য জাগিয়ে দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি।

ভবতোষ- সত্যি দাদা, তোমাদের পিতা পুত্রের এই সাধনা আমাদের সকলের শিক্ষনীয় বিষয়।

ঠাকুরদাস- তুমি তো জানো ভাই, কষ্ট না করলে কেষ্ট পাওয়া যায় না। এটা কেবল কথার কথা নয়, জীবন দিয়ে তা গভীরভাবে অনুশীলন করতে হয়।

ভবতোষ- সত্যি দাদা, প্রতিটি কথার অর্থ বুঝে নিজের জীবনের ওপর তা প্রয়োগ করতে হয়। কেবল তখনই যে কোন মহাবাণীর অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আচ্ছা দাদা, ঈশ্বরের বৃত্তির টাকা কীভাবে খরচ করছো।

ঠাকুরদাস- ও টাকার এক পয়সাও আমি নিজে খরচ করব না ভাই। ঈশ্বর ওর বৃত্তির ৫ টাকা আমার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিন্তু ওকে ওই টাকা স্বাধীনভাবে খরচ করবার অনুমতি দিয়েছি। সংসারের কাজে ওই টাকা আমি খরচ করব না। দু-টাকা বেতনে সংসার চালিয়েছি। বেতন বেড়ে ৫ টাকা হয়েছে। এই টাকাতেই সংসার আমার ভাল ভাবেই চলে যাবে।

ভবতোষ- তাহলে ঈশ্বর টাকাটা কিভাবে খরচ করবে বলে ভেবেছে?

ঠাকুরদাস- স্বাধীনভাবে টাকা খরচ করবার অনুমতি পেয়ে ঈশ্বর আমাকে বলেছে, ওই টাকা দিয়ে সে তার পড়ার সমস্ত খরচ চালাবে। এছাড়া অবশিষ্ট কিছু টাকা দিয়ে গরীব ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য মাসে মাসে সাহায্য করবে। আর মায়ের কাছে প্রতি মাসে এক টাকা করে পাঠাবে।

ভবতোষ- জানো দাদা, কথায় বলে উঠন্তি বৃক্ষ পত্রে চেনা যায়। ঈশ্বরের বাল্যকালই বুঝিয়ে দিচ্ছে ঈশ্বর খুব বড় হবে, তুমি দেখে নিও।

ঠাকুরদাস- তোমার কথা সত্য হয়ে উঠুক ভাই। ঈশ্বরকে তোমরা প্রাণভরে সেই আশীর্বাদ করো। [বাইরে থেকে কে যেন ডাক দেয়]

জনৈক- ঠাকুরমশাই বাড়িতে আছেন?

ঠাকুরদাস- কে? ভেতরে আসুন। [জনৈক ব্যক্তি প্রবেশ করে, সঙ্গে একটি ছোট ছেলে জনৈকব্যক্তি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ঠাকুরদাস ও ভবতোষবাবুকে প্রণাম করে, ছেলেটাও প্রণাম করে উভয়কে। পরনের ছিন্ন মলিন বসন ছেলেটার, পরনে একটা প্যান্ট, খালি গা, খুবই রুগ্ন।]

ঠাকুরদাস- কে আপনি? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

জনৈকব্যক্তি- বাবুমশাই [হাতজোড় করে] আমরা খুব ছোট জাত, জাতিতে মুচি, গরিব মানুষ।

ঠাকুরদাস- তাতে কি হয়েছে ভাই। মানুষের আবার ছোট-বড় কি? মানুষ মানুষই। মানুষের গায়ে কোন জাত লেখা থাকে না তা জেনে রেখো।

জনৈক ব্যক্তি-আপনি এত মহান বলে আপনার ছেলের নামও দয়াময়।

ঠাকুরদাস- কে দয়াময়? আমার ছেলের নাম তো ঈশ্বর।

জনৈকব্যক্তি-তা তো জানিনা ঠাকুরমশাই। আপনার ছেলেকে আমরা সবাই দয়াময় বলে চিনি। পাড়ার সবাইতো ওকে দয়াময় বলে ডাকে।

ঠাকুরদাস- কেন ওকে এই নামে ডাকে?

জনৈক ব্যক্তি-আপনি জানেন না বোধ হয়। ঠাকুরমশাই, আপনার ঐ ছেলে আমাদের মা বাপ। দুঃখে বিপদে কত না সাহায্য করে। দেখতে ওই টুকুন কিন্তু হৃদয়টা যে কত বড় তা বোধ হয় আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না।

ঠাকুরদাস- কী করেছে ঈশ্বর?

ভবতোষ- ব্যাপারটা কী একটু খানি খুলে বলতো ভাই।

জনৈক ব্যক্তি-আমার ছেলে বুবুন। আজ প্রায় দিন পনের আগে ওর কলেরা হয়েছিল। ডাক্তার দেখানোর পয়সা ছিল না। আপনার ছেলে দয়াময় তা জানতে পেরে ডাক্তার ডেকে এনে চিকিৎসা করানোর সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়। আর পথ্য কেনার জন্য চার আনা পয়সা আমার হাতে দিয়ে আসে। দয়াময়ের কৃপা না হলে আমার বুবুনকে বাঁচাতে পারতাম না ঠাকুরমশাই।

ভবতোষ- এসব তুমি কি বলছ ভাই।

জনৈক ব্যক্তি-যা বলছি সবই সত্যি। যে কয়েকদিন আমার ছেলে অসুস্থ ছিল সে কয়েকদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দয়াময় আমার ছেলের সাথে দেখা করে আসত। আপনার দয়াময়ের কৃপায় আমার বুবুন আজ সুস্থ। বাড়িতে আমার একটা পেয়ারা গাছ আছে। তাই কয়েকটা পেয়ারা পেড়ে এনেছি দয়াময়কে দেবার জন্য। আর এসেছি আপনাকে প্রণাম জানাবার জন্য।

ঠাকুরদাস- দাঁড়াও দাঁড়াও, ঈশ্বরকে ডাকছি। ঈশ্বর একবার ভিতরে এসো দেখে যাও কে এসেছে । [ঈশ্বর ঘরে প্রবেশ করে ছোট ছেলেটিকে দেখে তাকে বুকে টেনে নেয়]

ঈশ্বর- তুমি ভালো আছো বুবুন?

বুবুন- হ্যাঁ আমি ভালো আছি দাদা।

জনৈক ব্যক্তি-তোমার জন্য কয়েকটা পেয়ারা এনেছি দয়াময়। তুমি নিলে আমি ধন্য হবো।

[ঈশ্বর হাত পাতে। ওই ব্যক্তি ঝোলা থেকে দুটো পেয়ারা ওর হাতে তুলে দেয়। ঈশ্বর বাবার দিকে তাকায় তারপর বলে]

ঈশ্বর- বাবা বুবুনের গায়ে একটা ছেড়া জামাও নেই। আমার সেই চাদরটা কি ওকে দেবো বাবা।

ঠাকুরদাস- হ্যাঁ, তাই দাও। এই সবেমাত্র রোগ থেকে উঠেছে। ছেলেটার গায়ে কিছু নেই।[ঈশ্বর ছুটে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ওড়নি নিয়ে এসে ছেলেটার গায়ে জড়িয়ে দেয়। ছেলেটার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দু'জন হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে যায়।]

জনৈক ব্যক্তি- ঠাকুরমশাই,আমরা সবাই এই জন্যই ওকে ডাকি দয়াময় বলে। যে আমাদের হতভাগ্যের প্রকৃত বন্ধু।[উভয়ে প্রস্থান করে]

ভবতোষ- দাদা আমি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমাদের ঈশ্বর একদি দয়ার সাগর হিসাবে পরিচিত হবেই হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটা খেজুর ঝাঁটা, একটা সাদা চাদর বিছানো খাটিয়া, ঘরের একপাশে একটা আলনা, উপরের অংশে দু-তিনটা শাড়ি আর নীচে সাজানো লেপ কাঁথা বালিশ। ঈশ্বর - ছোট পাচি কাপড়, সাদা হাফ শার্ট। ভগবতী - সাধারণ লাল পাড় সাদা শাড়ি, হাতে শাঁখা নোয়া, কপালে লাল টিপ, আঁচলে চাবির গোছা। বাসন্তী রঙের চাওড়া পাড় শাড়ী, বয়সের ছাপ পড়েছে চোখে মুখে। স্থান -বীরসিংহ গ্রাম, সময় - সকাল।

বাসন্তী- বৌমা ও বৌমা।

ভগবতী- ওমা, পিসিমা যে। [বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে] তবু আমাদের কথা মনে পড়লো। কি ভাগ্য আমাদের। [কথা বলতে বলতে বসবার জন্য আসন পেতে দেয়। প্রণাম করে।]

বাসন্তী- [বসতে বসতে] এমন করে বলো না মা। আসবো আসবো করে সময় করে উঠতে পারিনি মা। তা তোমরা সব ভালো আছো তো?

ভগবতী- হ্যাঁ পিসিমা, আমরা সবাই ভালো আছি।

বাসন্তী- তা, কলকাতা থেকে ঈশ্বরের কোন খবর কি পেলে মা?

ভগবতী- আজ দু'দিন হল কলকাতা থেকে একজন লোক এসেছিল। তার হাতে আমাদের একটা চিঠিও। আমার কাছে ২ টাকা পাঠিয়েছে। আর এবার থেকে ঈশ্বর মাসে মাসে আমাকে ১ টাকা করে পাঠাবে বলে লিখেছে।

বাসন্তী- দু'টাকা পাঠিয়েছে? সে তো অনেক টাকা মা। তুমিতো তাহলে ওই টাকা দিয়ে একখান সোনার গহনা করে নিতে পার। এবার থেকে মা

তোমার দুঃখের দিন কেটে গেল।

ভগবতী- আপনাদের আশীর্বাদে আমার ঈশ্বর পরীক্ষায় প্রথম হয়ে মাসে মাসে ৫ টাকা করে জলপানি পাবে এবার থেকেই।

বাসন্তী- শুনে খুব খুশি হলাম মা। তুমি ভাগ্যবতী। এমন ছেলে কয়জনের হয় মা। এখন এক টাকায় তিন মণ ধান পাওয়া যাচ্ছে। আবার ওই এক টাকা দিয়ে প্রায় দেড় মন চাল সংগ্রহ করে নিতে পার।

ভগবতী- আমিও তাই ভাবছি পিসিমা। প্রতিমাসে ওই টাকা দিয়ে চাল কিনে গ্রামের গরিব দুঃখীদের দেব। তাতে আমার ঈশ্বরের কল্যাণ হবে।

বাসন্তী- সেকি মা, তোমার তো কোনো সোনাদানার অলংকার নেই। তাই বলি ছেলে যখন তোমায় টাকা পাঠাচ্ছে তখন পরে পরে দু চার থান সোনার অলংকার করিয়ে নাও। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে তা কাজে লাগতে পারে। তারপর না হয় দান ধ্যান যা পারো কর।

ভগবতী- সে হয় না পিসিমা। আমার সোনার অলংকারের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার শ্রেষ্ঠ অলংকার তো আমার ঈশ্বর। এর চেয়ে ভাল অলংকার আর কি আছে পিসিমা।

বাসন্তী- আমারই ভুল হয়েছে মা। তোমাকে আমি বুঝতে পারিনি। এখন বুঝেছি এমন মা নাহলে এমন ছেলে হয় না।

ভগবতী- তখন থেকেই কেবল কথা হচ্ছে। আপনি পরিশ্রান্ত। বাড়ির ভেতরে এবার চলুন।

বাসন্তী- তোমাকে আগে ভাগে জানিয়ে রাখছি মা, আজ বিকেলেই আমি ফিরে যাব। বাড়িতে ভীষণ কাজ।

ভগবতী- সে বললে আমি শুনছি না পিসিমা। কতদিন পরে এলেন। আজই চলে যাব বললেই হল। আজ তো নয় আগামীকাল তখন দেখা যাবে। উঠুন তো এখন। [হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায় বাসন্তীকে ভগবতী দেবী]

তৃতীয় দৃশ্য

একটি গাছের ডালা পোতা থাকবে স্টেজের মাঝখানে। ওই গাছের সামনে একটা বেদি করা থাকবে। ওই বেদিতে বসে ঈশ্বর। ওরই পাশে দাঁড়িয়ে জনৈক বালক। ঈশ্বরের কাঁধে থাকবে একটা ব্যাগ। তাতে থাকবে একটা টিফিন কৌটা। ঐ কৌটার মধ্যে থাকবে একটা পাউরুটি ও একটা কলা। ঐ বেদীর উপরে বসে ছেলেটা খেতে আরম্ভ করে। জনৈক বালক - ছেঁড়া জামা প্যান্ট। ঈশ্বর- পরনে ছোট ধুতি আর শার্ট, সুপ্রকাশ প্যান্ট শার্ট।

ঈশ্বর- তোমার কি আজ কোনো কিছু খাওয়া হয়নি ভাই।

বালক- না, বাড়িতে কোন খাবার ছিল না।

ঈশ্বর- তোমার মা-বাবা আছেন?

বালক- বাবা নেই, মারা গেছেন, মা আছে।

ঈশ্বর- তোমার মা কোথায়?

বালক- লোকের বাড়িতে থালা বাসন মাজার কাজ করে। দুদিন মা অসুস্থ। তাই কাজ করতে যেতে পারেনি। আর আমার ও মায়ের কোন খাবার জোটেনি।

ঈশ্বর- তোমার মায়ের কী হয়েছে?

বালক- পাড়ার লোকেরা বলছে মায়ের বসন্ত হয়েছে।

ঈশ্বর- বসন্ত হয়েছে? কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়নি নিশ্চয়। তোমার বাড়ি কোথায়?

বালক- শোভাবাজারের কাছে একটা বস্তি আছে। ঐখানে একটা তালপাতার ছাওয়া খুপরি ঘর আছে। ওইখানে থাকি।

ঈশ্বর- আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বস এখানে। এই কৌটাতে আমার টিফিন আছে। ওই টিফিনটা তুমি খেয়ে নাও আগে, তারপর দেখছি কি করা যায়। [ছেলেটা কৌটা হাতে তুলে নিয়ে খেতে শুরু করে। ঈশ্বর তার একজন সহপাঠীকে দেখতে পেয়ে ডাক দেয়] এ্যাই সুপ্রকাশ, এদিকে শুনে যাও। [ডাক শুনতে পেয়ে এগিয়ে আসে সুপ্রকাশ, ঈশ্বরের কাছে এসে বসে]

সুপ্রকাশ- কী ব্যাপার? তুমি টিফিন না খেয়ে ওই ছেলেটাকে খাওয়াচ্ছো বুঝি।

ঈশ্বর- হ্যাঁ ভাই, ওর সারাদিন কিছু খাবার জোটেনি।

সুপ্রকাশ- আরে ভাই পৃথিবীতে এমনই বহু ছেলেমেয়ে অভুক্ত থাকে, তাদের ক'জনকে তুমি খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?

ঈশ্বর- অতদূর আমি ভাবি না। চোখের সামনে যাদের দেখতে পাই, সাধ্যমত তাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করি। আমার একার পক্ষে সবাইকে তো দেখা সম্ভব নয় ভাই।

সুপ্রকাশ- তা তোমার যা অভিরুচি তাই কর। এসব ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার নেই। তবে তুমি আমাকে ডাকলে কেন ভাই তাই বল।

ঈশ্বর- খুব একটা অসুবিধায় পড়েছি, তাই তোমার কাছে সাহায্য চাইছি। যদি ...

সুপ্রকাশ- কি সাহায্য চাও বলো?

ঈশ্বর- জানো ভাই, ওই ছেলেটার মায়ের বসন্ত হয়েছে। শোভাবাজারের

বস্তিতে থাকে। ওদের তো কোন টাকা পয়সা নেই, তাই ওর মায়ের চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য করতে চাই।

সুপ্রকাশ- তা তো ভালো কথা। তা আমি কি করতে পারি বল।

ঈশ্বর- ভাই সুপ্রকাশ, কিছু মনে করো না। আমার কাছে আজ ১১ আনা ছিল, তা একজনকে দিয়ে ফেলেছি। ভাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ তুমি আমাকে এক টাকা ধার দাও। আগামীকাল আমি তোমাকে দিয়ে দেব। এই অনুরোধটুকু রাখবে ভাই।

সুপ্রকাশ- তোমাকে টাকা ধার দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জানো কি ভাই আমার কাছে এখন ১১ আনার বেশি নেই। আগামীকাল তোমাকে এক টাকা দিতে পারি।

ঈশ্বর- আচ্ছা ঠিক আছে। ওই ১১ আনাই দাও। আগামীকাল তখন দেখা যাবে। [সুপ্রকাশ ১১ আনা পয়সা ঈশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়] তোমাকে আর একটা কথা বলব ভাই।

সুপ্রকাশ- আচ্ছা, কী বলো?

ইশ্বর- তুমিও চলো আমার সঙ্গে ওই ছেলেটার মাকে দেখে আসি। তুমিও তো ওই পথ ধরেই বাড়ি ফিরবে।

সুপ্রকাশ- না ভাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এসব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি নেই। তাছাড়া তুমি বলছ ওর মায়ের বসন্ত হয়েছে। বসন্ত হলে কারুর বাড়িতে যেতে নেই তা জানো? ঐ রোগ খুবই ভয়ঙ্কর। বাপরে বাপ! বসন্ত রোগের কথা বললে আমার বুক টিপটিপ করে, জানো ওকে শীতলা মায়ের দয়া হয়েছে।

ঈশ্বর- দূর পাগল! ওটা কোন মায়ের দয়া নয়। রোগের প্রকাশ। তাছাড়া এতে ভয় পাওয়ার কি আছে? এরোগ যে কোনো লোককে তো হতে পারে। তাছাড়া যদি ধরো তোমার মায়ের কখনো বসন্ত হয় তখন কি তুমি তার কাছে যাবে না।

সুপ্রকাশ- দেখো ঈশ্বর, তুমি ক্লাসের সেরা ছাত্র জানি। তবু বলব সব জায়গায় সব যুক্তি চলে না। কোথায় একটা বস্তির মেয়ে আর কোথায় আমার মা। এ দুয়ের মধ্যে কি তুলনা চলে?

ঈশ্বর- কিছু মনে করো না ভাই, তোমার মা আমাদের সকলের মায়ের মত,আবার ওই ছেলেটার দুখিনী মাও আমাদের মায়ের মতো। মা মা'ই। কোন মায়ের সঙ্গে অন্য কোন মায়ের কোন পার্থক্য নেই ভাই।

সুপ্রকাশ- এত বড় উদার মনের অধিকারী আমি নই ভাই। তাছাড়া ওই রোগ

অত্যন্ত ছোঁয়াচে।

ঈশ্বর- আর সেই জন্যই তো আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত। ওর মায়ের সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা উচিত। আমরা শিক্ষিত হয়ে যদি রোগের ভয়ে দূরে সরে থাকি, তাহলে ওই ছোঁয়াচে রোগ যে আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে ভাই। তখন তুমি আমিও হয়তো রক্ষা পাবো না। আগুন জ্বলে উঠলেই যেমন তাকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা নেভানো দরকার, ঠিক তেমনই ওই সমস্ত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাই আমাদের তো ওখানে যাওয়াই উচিত। আশেপাশের লোকজনকে সবকিছু বুঝিয়ে বলা দরকার।

সুপ্রকাশ- তাদের তুমি কি বোঝাবে?

ঈশ্বর- তাদের বলব কতগুলি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য। আর বলব যেমন করে হোক ডাক্তার ডেকে ওই রোগীর চিকিৎসা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে ওদের পাশে থেকে চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হতে পারে।

সুপ্রকাশ- তোমার যুক্তির সঙ্গে আমি পেরে উঠব না ভাই। হার স্বীকার করছি, তবে এ যাত্রা আমাকে ছেড়ে দাও ভাই। মনটা ঠিক করি তারপর দেখা যাবে।

ঈশ্বর- হা হা হা, এত ভয় পেলে চলে? মৃত্যুতো জীবনে একবারই আসে ভাই। মৃত্যুকে জয় করে এগিয়ে চলাই তো মানুষের জীবন। তাইতো কবি বলেছেন-

মৃত্যু ভয়ে ভীত যে জন
মৃত্যুর আগে বহুবার মরে।

চতুর্থ দৃশ্য

[রোগিণী-সাধারণ ডোরা দেওয়া শাড়ি। রাখাল - ছেঁড়া হাফ প্যান্ট, শার্ট। প্রথম প্রতিবেশী -সাধারণ শাড়ি, ব্লাউজ। দ্বিতীয় প্রতিবেশী -সাধারণ শাড়ি, ব্লাউজ। তৃতীয় প্রতিবেশী - সাধারণ শাড়ি, ব্লাউজ। ডাক্তার-ফুল প্যান্ট, শার্ট, টেথোস্কোপ ঝোলানো ডাক্তারি ব্যাগ।

অসুস্থ রাখালের মা একটা নোংরা বিছানায় শুয়ে রোগ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ঈশ্বর এবং রাখাল রোগীর শয্যাপাশে এসে দাঁড়ায়। রাখালের মা যন্ত্রণায় কাতর। ঈশ্বর তার কপালে হাত রাখে।]

রাখালের মা- আঃ - আঃ - মা - মাগো । রাখাল রাখাল। [কপালে হাতের স্পর্শ পেয়ে] কে রাখাল? তুই এলি বাপ, আমি আর বাঁচবো না রে।

রাখাল- না, মা আমি নই, তোমার কপালে হাত রেখেছে ঈশ্বর দা। তুমি কষ্ট করে চোখ মেলে একটুখানি তাকাও।

রাখালের মা- কে তুমি বাবা ঈশ্বর?

ঈশ্বর- আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না মাসিমা। আপনি শান্ত হোন, ডাক্তার বাবুকে ডেকে এসেছি, উনি এক্ষুনি এসে পড়বেন।

রাখালের মা- আমাদের তো পয়সা নেই বাবা। কোথা থেকে....

ঈশ্বর- অতসব আপনাকে ভাবতে হবে না। সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

[৩ জন প্রতিবেশিনী উঠোনে এসে দাঁড়ায়]

প্রথম প্রতিবেশী- তুমি কাদের ঘরের ছেলে গো। রোগীর গা ঘেষে বসেছো। তোমার ভয় নেই। ও যে ভয়ঙ্কর ব্যামো গো।

ঈশ্বর- রোগটা যে খুবই ভয়ঙ্কর তা বুঝি। কিন্তু তা বলে ভয় পেলে চলবে কেন? ওর তো চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।

দ্বিতীয় প্রতিবেশী-বসন্ত হলে তার আবার চিকিৎসা কি? ওতো মায়ের দয়া মায়ের দয়ায় ও ভালো হতে পারে। আবার মরতেও পারে। মায়ের নামে এক ঘটি জল তুলে রেখেছি, ওর মাথার কাছে। ঐ জল ও প্রত্যহ খাবে। তারপর যা হবার তাই হবে। এক্ষেত্রে আমাদের কারোর কোন হাত নেই।

তৃতীয় প্রতিবেশী-তুমি বোধহয় এসব কিছু জানো না বাছা।

দ্বিতীয় প্রতিবেশী-এসব জানবে কি করে। বয়সটা তো অত্যন্ত কাঁচা। রাখালের দু-তিন বছরের বড় হতে পারে। তা বলি শোন বাছা-তোমায় তো আমরা চিনি না, এত ছোঁয়াছুঁয়ি ভালো নয়। তাছাড়া তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব উঁচু ঘরের ছেলে। আমরা বাপু মেথর। তোমাকে ছুঁয়ে ফেলাও অপরাধ।

ঈশ্বর- আহা, আপনারা এমন করে ভাবছেন কেন? আমি আপনাদেরই মত মানুষ, মানুষের আবার উঁচু-নিচু কি? তা শুনুন-এটা রোগের প্রথম অবস্থা। বিন্দুমাত্র ভয় নেই, ওঁর কাছে বসলেও ভয় নেই। তবে ভয় তখনই যখন রোগী ক্রমে ভালো হয়ে উঠবে, তার গায়ের ওই ফোস্‌কাগুলো শুকিয়ে যখন মামড়ি উঠবে, তখনই।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিবেশী- সেকি গো?

ঈশ্বর- হ্যাঁ, এটাই ঠিক কথা। ঐ মামড়িগুলো বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে যে কোনো সুস্থ মানুষ এর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তখনই রোগীকে মশারির মধ্যে রাখতে হবে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। এই জন্যই তো

লোকে বলে যা আপনারাও জানেন-কলেরার যাওয়া আর বসন্তের হাওয়া। হ্যাঁ শুনুন আপনারা- রাখাল খুব ছোট তাই ও তার মায়ের পরিচর্যা যত্ন করে করতে পারবে না। দয়াকরে সাধ্যমত ওকে একটু সাহায্য করবেন। বিন্দুমাত্র ভয় করবেন না। ভয়ের কিছু নেই [বাইরের দিকে তাকিয়ে]

এইতো ডাক্তার বাবু এসে গেছেন। আসুন ডাক্তারবাবু [ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে তারপর উঠে দাঁড়ান]

ডাক্তার- না ভয়ের কিছু নাই। বসন্তের গুটি আরও দু-একদিন বেরোবে। রোগীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। কাপড় মাঝে মাঝে গরম জলে সেদ্ধ করে রোদে ভালো করে শুকিয়ে নেবেন। গরম জল বার্লি আর পারলে হালকা গরম দুধ ও ফলের রস খাওয়াবেন। আর রোগীকে মশারির মধ্যে রাখবেন। ঘরে ধূপধূনা জ্বালাতে পারলে ভালো হয়। আমি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে যাচ্ছি। রোগীর বিছানার চারধারে, ঘরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দেবেন। আর কয়েকটা ট্যাবলেট দিয়ে যাচ্ছি তা প্রত্যহ তিনবার খাওয়াবেন। প্রয়োজনে আমাকে খবর দেবেন। ভয় করবেন না। ভয়ের কিছু নেই। [কয়েকটা ট্যাবলেট ঈশ্বরের হাতে তুলে দেন] ঈশ্বরকে বলেন, শোনো খোকা, তোমার নাম কী?

ঈশ্বর- আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র।

ডাক্তার- তোমার পদবী কী? থাকো কোথায়?

ঈশ্বর- আমার পদবী বন্দোপাধ্যায়, থাকি বড়বাজারের কাছে জগৎবল্লভ সিংহ মহাশয়ের বাড়িতে।

ডাক্তার- তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার নিজ বাড়ি কোথায়?

ঈশ্বর- মেদিনীপুর, বীরসিংহ গ্রাম।

প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রতিবেশী [বিস্ময়]- ব্রাহ্মণের ছেলে! মেদিনীপুর!

ডাক্তার- তুমি নিশ্চয়ই পড়াশোনা করছো।

ঈশ্বর- হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমি কলকাতার সংস্কৃত কলেজে চতুর্থ বর্ষে পড়াশোনা করছি।

ডাক্তার- [এগিয়ে এসে ঈশ্বরের মাথায় হাত রেখে] একেই বলে মানুষ হওয়া। তুমি পড়াশোনার যথার্থ মূল্য দিতে পেরেছো। এজন্য তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি, তুমি বড় হও। আর শোনো কোনদিন আমার ওষুধের মূল্য দিতে হবে না তোমাকে। যখন খুশি তুমি আমার সাহায্য চাইতে পারো। [ঈশ্বর নত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে, আর সবাই ঈশ্বরের

দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে]

ডাক্তার- এখন চলি ঈশ্বর, দীর্ঘজীবী হও।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিবেশী- [অশ্রু সজল চোখে] দেবতা তো কখনো দেখিনি আমরা, শুনেছি কেবল তাদের নাম। আমাদের কাছে তুমিই আমাদের দেবতা। তুমিই আমাদের ঈশ্বর।

পঞ্চম দৃশ্য

বটগাছের ডালা। ঈশ্বর-সাধারণ ধুতি,শার্ট। গুরুমশাই-সাধারণ ধুতি, গেঞ্জি। ঈশ্বরের সাথীদের-সাধারণ হাফ শার্ট। গদাধর -সাধারণ ধুতি, হাফ শার্ট। হরিহর - সাধারণ ধুতি, হাফ শার্ট।

গান-

আয়রে আয়রে ছুটে আয়রে ছুটে
আয়রে আয়
মোদের মাঝে এসেছে আজ মোদের দয়াময়।
খুশির নেশায় আমরা মাতি
কেটেছে আজ দুখের রাতি
আসুক না ঝড়, করবো না ভয়
আছে দয়াময়।
মোদের সাথী পেয়েছি আজ
নাইকো কোনো ভয়
ও যে মোদের ভালোবেসে ভরেছে হৃদয়
বীরসিংহের আজকে সবাই
আনন্দে গান গাই যে সদাই
দুখের দিনের সাথী পেয়ে
ভুলেছি সব ভয়।

গুরুমশাই- ঈশ্বর বাবা তুমি কখন এলে?

ঈশ্বর- [প্রণাম করে] আমি আজ দুপুরে এসেছি মাস্টারমশাই। [সবাই এসে গুরুমশাইকে প্রণাম করে]

গুরুমশাই- তোমাকে বহুদিন পর পেয়ে খুবই খুশি হলাম বাবা। তুমি বীরসিংহের নাম রেখেছ এইজন্য আরো খুশি হয়েছি বাবা।

ঈশ্বর- আপনার আশীর্বাদে মাস্টারমশাই।

গুরুমশাই- আমার আর কতটুকু জ্ঞান ঈশ্বর। তুমি যে জ্ঞানের সাগর হতে চলেছ।

ঈশ্বর- না মাস্টারমশাই, আপনার পায়ের ধুলির যোগ্য আমি নই। আপনি আমাকে যা দিয়েছেন সে ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না মাস্টারমশাই।

গুরুমশাই- তোমার মত কৃতী ছাত্র পেয়ে আমি ধন্য ঈশ্বর। তোমার এগিয়ে চলাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

ঈশ্বর- আপনি আমাকে সেই আশীর্বাদ করুন মাস্টারমশাই। আমি যেন আপনার প্রত্যাশা পূরণের যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

গুরুমশাই- হ্যাঁ, তুমি এবার যাও বাবা। তোমার বন্ধুদের নিয়ে খেলা কর। আমি এবার যাচ্ছি ঈশ্বর। তুমি বড় হও। [ঈশ্বর প্রণাম করে, মাস্টার মশাই চলে যান]

গোপাল- দয়াময়, তুমি আমাদের কলকাতার গল্প বলো। আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে।

সকলে- হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সবাই শুনতে চাই।

ঈশ্বর- আচ্ছা ঠিক আছে। চলো আমরা ওই বটগাছটার তলায় বসে সবাই মিলে গল্প করবো।

সকলে- চল হে চল, সবাই মিলে চল। [দলবেঁধে ওরা চলে যায়। হরিহর ও গদাধর প্রবেশ করে]

হরিহর- আজকে আমাদের ছেলেদের খুশির দিন।

গদাধর- হবে না, বহুদিন পরে ঈশ্বরকে কাছে পেয়েছি যে।

হরিহর- কে বলবে ওকে বামুন ঘরের ছেলে। উঁচু জাত বলে কোন অহংকার নেই। তাছাড়া এই অল্প বয়সে এত পড়াশোনা করেছে, ভাবতেও অবাক লাগে।

গদাধর- সত্যিই দাদা, ঈশ্বরকে মনে হয় ও যেন আমাদের ঘরের ছেলে। গ্রামের সবাই ঈশ্বর বলতে অজ্ঞান।

হরিহর- ঈশ্বরের মা জননীও করুণাময়ী মায়ের মতো। গ্রামের সকলের প্রতি তাঁর অসীম দয়া।

গদাধর- চল দাদা চল, সন্ধ্যাতো ঘনিয়ে এলো। মা জননী কেন ডেকে পাঠিয়েছেন, তা তো জানা দরকার।

হরিহর- হ্যাঁ ভাই তুমি ঠিকই বলেছ। যেতে হবে বৈকি? মায়ের ডাক কী অবহেলা করা চলে?

গদাধর- জানো দাদা গত সপ্তাহে মা জননী তিন সের চাল দিয়ে গিয়েছিলেন বলে, আমি ছেলে মেয়ের মুখে তবু একমুঠো ভাত তুলে দিতে

পেরেছি। তা না হলে কি যে হতো, তা ভেবে পাই না।

হরিহর- মা যে মোদের ভগবতী। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তার যত ভালোবাসা যে আমাদের জন্য। চল ভাই চল, বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।

গদাধর- হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চল। [উভয়ই প্রস্থান করে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[দুর্গাদেবী- সাদা ধুতি,সাদা ব্লাউজ। দুলালের-মাথায় ধামা, পাল কুল, চৌকি, ক্যালেন্ডার।

দুর্গাদেবী একটা চৌকির ওপর বসে। ঠাকুরদাস মায়ের পায়ের কাছে মেঝেতে বসে। উভয়ের কথাবার্তা হচ্ছিল]

ঠাকুরদাস- মা, আগামীকাল ভোরে ঈশ্বরকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাব। ঈশ্বরের পড়াশোনা আছে, তাছাড়া আমরও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি একটু ফিরে যাব স্থির করেছি।

দুর্গাদেবী- তোর শরীরটা এখনো ঠিক মতো সেরে ওঠেনি, তাই বলছিলাম আর দু-চারদিন থেকে গেলে তো পারতিস।

ঠাকুরদাস- তা ভালো হতো ঠিকই। কিন্তু কাজের এখন ভীষণ চাপ মা।

দুর্গাদেবী- তোর এবার বেতন কিছু বেড়েছে হরিশ এসে বলেছিল।

ঠাকুরদাস- এবার বেতন বেড়ে ৮টাকা হল। তাই কাজের চাপ বেড়েছে। তাছাড়া আরো দু' চারটা কাজ করি মাঝে মাঝে।

দুর্গাদেবী- না বাবু আর বেশি কাজ বাড়িয়ে লাভ নেই। তোর শরীরটা ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া ওই ৮টাকা হলে তো আমাদের সংসার বেশ ভালোভাবেই চলে যাবে। তাছাড়া দাদুভাইও মাসে মাসে জলপানির টাকা পাচ্ছে। তোকে আর অত কষ্ট করতে হবে না। কথাটা আমার মাথায় রাখিস।

ঠাকুরদাস- আচ্ছা মা আচ্ছা, তুমি যখন বলছ তখন বাড়তি বোঝা একটু কমিয়ে ফেলব।

দুর্গাদেবী- হ্যাঁ, শোন্, দাদুভাই তো আমার এবার ১০ বছরে পা দিল। আর তো দেরি করা চলে না।

ঠাকুরদাস- কীসের কথা তুমি বলছ মা?

দুর্গাদেবী- ও মা তোকে খুলে বলতে হবে?

ঠাকুরদাস- [মাথা চুলকে] আমার তো মাথায় কিছু আসছে না মা।

দূর্গাদেবী- তা আসবে কেমন করে, কলকাতায় গিয়ে ম্লেচ্ছদের সাথে মিলেমিশে ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছিস। ব্রাহ্মণদের ক্রিয়াকর্মের কথা মনে থাকবে আর

কী করে।

ঠাকুরদাস- এবার আমার মনে পড়েছে। তুমি ঈশ্বরের পৈতে দেওয়ার কথা বলছো তো?

দুর্গাদেবী- তাও কি আমায় বলে দিতে হবে? তোর কত বছরে পৈতে দিয়েছিলাম তা মনে আছে?

ঠাকুরদাস- বোধহয় ৮ বছরে। তাই না মা।

দুর্গাদেবী- তখন কোন ধুমধাম করতে পারিনি। সে দিন গেছে-

ঠাকুরদাস- সে সময়ের কথা আমিও ভুলতে পারিনি মা। সেদিন গেছে কেটে মা। কত দুঃখের দিন গেছে।

দুর্গাদেবী- শোন বাছা, আমার একটা আবদার তোকে এবার রাখতে হবে।

ঠাকুরদাস- কী করতে তুমি আমাকে আদেশ করো মা। আমি তোমার সেই ইচ্ছা পূরণ করব।

দুর্গাদেবী- আমার আদরের দাদুভাইয়ের পৈতে তে আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ডেকে ধুমধাম করে একটা অনুষ্ঠান করতে চাই।

ঠাকুরদাস- সে তোমার ইচ্ছা হলে কর। আমার কোন আপত্তি নেই। কেবল কী করতে হবে সেটাই আদেশ কর। তবে মা আমি ঠিক ভরসা পাচ্ছিনে।

দুর্গাদেবী- কিসের কথা বলছিস?

ঠাকুরদাস- জানো মা, তোমার আদরের নাতির পৈতে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটা আপত্তি আছে। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

দুর্গাদেবী- কি যে সব অলুক্ষুণে কথা বলিস, তার কোন ঠিক নেই। বামন ঘরের ছেলে পৈতে নেবে না তো কী? তোকে সে কিছু বলেছে?

ঠাকুরদাস- না তা আমাকে স্পষ্ট করে কোন বলেনি। তবে নানান কথার ফাঁকে যা বুঝেছি এ ব্যাপারে ঈশ্বরের আপত্তি আছে। তাই এ ব্যাপারে আমি জোর করতে সাহস পাইনি। মুখের সামনে আমাকে না বলে দিলে সেটা আমার পক্ষে খুবই কষ্ট হবে, তাই।

দুর্গাদেবী- না, না, দাদুভাই আমার পড়াশুনায় সবার সেরা। ও এমন ভুল করতে পারে না।

ঠাকুরদাস- তুমি ওকে তাই বোঝাও মা। আমি ঠিক সাহস পাচ্ছিনে। এতোটুকু দুধের ছেলে কিন্তু যুক্তিতে ওর সঙ্গে আর পেরে উঠতে পারছি না।

দুর্গাদেবী- আচ্ছা, তুই এতসব ভাবিস না। এ ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দে। দেখি কী করা যায়।

ঠাকুরদাস- আমার গ্রামে একটু কাজ আছে মা। এখন তবে আমি আসছি মা। [বেরিয়ে যায়]

দুর্গাদেবী- হ্যাঁ শোন, বৌমাকে এদিকে একটু খানি ডেকে দিয়ে যাস।

ঠাকুরদাস- আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। [চলে যায়]
[দূর থেকে বলতে বলতে আসে]

ভগবতী- আমাকে কেন ডাকছেন মা। [শাশুড়ীর পায়ের কাছে এসে বসে]

দুর্গাদেবী- শোন বৌমা, আগামী মাসে আমার দাদু ভাইয়ের পৈতে দেব। সেই মত ছেলের সঙ্গে কথা হলো। তুমি এবার থেকে কী কী করতে হবে তার একটা তালিকা তৈরী করো।

ভগবতীদেবী- আমি বলি কি মা আপনি একান্তে ঈশ্বরের সঙ্গে একটি বার কথা বলুন। তারপর যা করার তাই করবো।

দুর্গাদেবী- তুমি এসব কী বলছ মা? দাদুভাইয়ের সঙ্গে আমাকে কী কথা বলতে হবে?

ভগবতীদেবী- ওর পৈতে দেবার ব্যাপারটা নিয়ে-

দুর্গাদেবী- তুমি কি ওর কাছ থেকে কিছু জেনেছ মা?

ভগবতী- আমি পৈতে দেবার ব্যাপারে একবার কথা তুলেছিলাম।

দুর্গাদেবী- তাতে ও কী বলেছে?

ভগবতী- [কেঁদে ওঠে] না মা আমি কিছু বলতে পারব না।

দুর্গাদেবী- না না এমনভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন? আমাকে তুমি বলো না দাদু ভাই তোমাকে কী বলেছে?

ভগবতী- ও বলেছিল -তুমি আমাকে বল না মা। আমি ওই একগোছা সুতো গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারব না।

দুর্গাদেবী- বৌমা!

ভগবতী- হ্যাঁ মা, ও আরও বলেছিল- আমি তো বাগদি, মুচি, মেথরের বাড়িতে যাই। তাদের ছেলেদের সঙ্গে ভাইয়ের মতো মেলামেশা করি। আমি যদি ওই একগোছা পৈতে পরি তাহলে ওরা আমার কাছে আসতে ভয় পাবে। আমিও ওদের ছুঁতে পারব না। ব্রাহ্মণকে ছুঁলে পাপ হবে সেই ভয়ে ওরা দূরে সরে যাবে। আমি তা কোনমতে সইতে পারবো না মা। তোমরা আমাকে এই অনুরোধ করোনা। তোমার পায়ে পড়ি। ওর কথা শুনে ওকে আর আমি কিছু বলতে পারিনি মা।

দুর্গাদেবী- তুমি আর ওসব নিয়ে দুঃখ করো না মা। [মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়]। যা বলবার আমি বলবো। ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। দেখি সিদ্ধ পুরুষ তান্ত্রিক সাধকের বড় নাতি আমাকে কী বলে সান্ত্বনা দেয়।

ভারী বিদ্বান হয়ে উঠেছে। আসুক একবার আমার কাছে। হ্যাঁ মা, তুমি যাও। দাদুভাই এতক্ষণে ফিরে এসেছে। তুমি ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

ভগবতী- হ্যাঁ মা, সেই ভালো আমি আপনার কাছে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [দুর্গাদেবী আনমনে বসে বসে কী যেন ভাবেন। এমন সময় ঈশ্বর প্রবেশ করে। সঙ্গে হারু বাগদির ছেলে দুলাল উঠোনের এক ধারে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা ধামা।]

ঈশ্বর- দেখো ঠাকুরমা কাকে এনেছি।

দুর্গাদেবী- ও কে? ও কে তো আমি চিনি নে?

ঈশ্বর- ও তো হারু বাগদি কাকার ছেলে দুলাল?

দুর্গাদেবীর- বাগদির ছেলে?

ঈশ্বর- হ্যাঁ ঠাকুরমা, ও কী এনেছে জানো?

দুর্গাদেবী- কি এনেছে?

ঈশ্বর- পাল কুল এনেছে ও। তুমি আমায় কুলের আচার করে দিও। আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। দুলাল হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কুলের ধামাটা ঠাকুমার কাছে নিয়ে আয়।

দুর্গাদেবী- না-না এখানে আনতে হবে না। ঐখানে রেখে যা। যতসব অলুক্ষুণে কাজ। এসব তোমার কী হচ্ছে দাদুভাই? [দুলাল ধামাটা রেখে ঠাকুমাকে দূর থেকে প্রণাম করে চলে যায়]

ঈশ্বর- কেন? কী এমন করলাম? [কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে]

দুর্গাদেবী- আঃ! আমাকে আবার ছুঁয়ে ফেল্লিতো?

ঈশ্বর- তাতে কী হল?

দুর্গাদেবী- অনেক কিছু হয়? নিশ্চয়ই ওই বাগদির ছেলেটাকে ছুঁয়েছিলি?

ঈশ্বর- হ্যাঁ তো ছুঁয়েছি। শুধু আজ নয় ছোটবেলা থেকে কতবার একসাথে খেলেছি, বসেছি, গল্প করেছি।

দুর্গাদেবী- হ্যাঁ তো করেছ বুঝলাম। তখন তুমি ছোট ছিলে। এখন বড় হয়েছ। আর কয়েকদিন পরে তোমার পৈতে হবে। তখন কিন্তু ওসব ছোঁয়াছুঁয়ি আর চলবেনা। এই আমি বলে রাখছি।

ঈশ্বর- এসব তুমি কী বলছো ঠাকুরমা?

দুর্গাদেবী- আমি ঠিকই বলছি। যখন ছোট ছিলে তখন ওসবে কোনো দোষ ছিল না। এখন বড় হয়েছ, বিদ্যা বুদ্ধি বেড়েছে। এখন তোমার এসব করা চলে না। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। ওরা ছোট জাত। তাই বাছবিচার করে চলতেই হবে। এসব আমার কোন মনগড়া কথা নয় দাদুভাই।

তুমিতো কত পড়েছ। এসব শাসতরের কথা। তোমার নিশ্চয়ই অজানা নেই?

ঈশ্বর- ঠাকুরমা ! তুমি একটা জায়গয়া বোধ হয় ভুল করছ?

দুর্গাদেবী- কী ভুল করছি ভাই?

ঈশ্বর- শোন ঠাকুরমা, জাত বিচারে কোন মানুষ বড় কিংবা ছোট হয় না। মানুষ বড় হয় তার কর্মের দ্বারা। তাইতো লোকে বলে- "সংসারেতে বড় হওয়া কঠিন ব্যাপার, সংসারে সে বড় হয় বড় গুণ যার"।

দুর্গাদেবী- তাহলে কী শাসতরের কথাগুলো মিথ্যে হয়ে যাবে?

ঈশ্বর- ঠাকুরমা যা সত্য নয় তা তো একদিন মিথ্যে হবেই।

দুর্গাদেবী- এসব তুমি কী বলছো দাদুভাই। তোমাকে ঘিরে কত স্বপ্ন আমার। বছর বছর পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তুমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ। তোমার মুখ থেকে এসব কথা শোভা পায় না ভাই। তুমি বিখ্যাত পন্ডিত রামজয় তর্কভূষণের নাতি, এ কথা কখনো ভুলে যেও না।

ঈশ্বর- ঠাকুরমা, তুমি দুঃখ করো না। পড়াশোনা করেছি বলেই তো এসব জানতে পারছি। শাস্ত্রে যেসব কথা লেখা আছে তার অধিকাংশ কথা মন গড়া আর বানানো। ওই কথাগুলো যুক্তি দিয়ে বিচার করলেই তার মিথ্যাটা ধরা পড়ে। এতদিন শাস্ত্রের কথা গুলি অন্ধ ভাবে মেনে চলেছি। যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করিনি।

দুর্গাদেবী- তার কী কোন প্রমাণ আছে ভাই?

ঈশ্বর- অসংখ্য প্রমাণ আছে ঠাকুরমা। তারমধ্যে একটা কথা তোমাকে বলি,-এই যে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে ব্রম্ভার মুখ থেকে নাকি ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হয়, বক্ষস্থল থেকে নাকি ক্ষত্রিয়, উরুদেশ থেকে বৈশ্য, আর পদযুগল থেকে শূদ্র জাতির উৎপত্তি। জাতি সৃষ্টির এই যে সাধারণ নিয়মটি যা আমরা শাস্ত্র থেকে জেনেছি-তা তো যুক্তিবিচারে টেকে না। বাস্তবে এই জাতিভেদ প্রথা তৈরি করেছে মানুষ। সেদিন যে প্রয়োজনে এই জাতের সৃষ্টি হয়েছিল-আজকে তার কোন প্রয়োজন নাই।

দুর্গাদেবী- এসবের প্রয়োজন আছে কি নাই অতসব কুট কথা আমার মাথায় ঢোকে না ভাই। তবে দাদুভাই আমার একটি মাত্র সাফ কথা, আগামী ফাল্গুনে তোমার পৈতে দেবই। এই ব্যাপারে তোমার কোন আপত্তি আমি শুনবো না ভাই। একথা আমি আগেভাগে জানিয়ে রাখলাম।

ঈশ্বর- [হেসে] আচ্ছা ঠাকুরমা পৈতে নিলে কী হয়?

দুর্গাদেবী- দেখো কথার ছিরি কেমন। কী আর হবে। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছ

তার যা নিয়ম-রীতি তা তো তোমায় পালন করে চলতে হবে। আর পৈতে হলেই তোমাকে ব্রাহ্মণ বলে মানবে।

ঈশ্বর- ঠাকুরমা আমি ব্রাহ্মণ হতে চাই না, আমি মানুষ হতে চাই। আচ্ছা ঠাকুরমা আমি যদি ব্রাহ্মণ না হই তাহলে আমি কী?

দুর্গাদেবী- আবার পাগলামি। এখন তুমি কেবল ব্রাহ্মণের ছেলে। হলো তো?

ঈশ্বর- আচ্ছা ঠাকুরমা তোমার তো পইতে নেই। তবু ব্রাহ্মণ এর স্ত্রী বলেই তো ব্রাহ্মণী। অথচ আমার পৈতে নেই বলে আমি ব্রাহ্মণ নই কেন? আসলে ঠাকুরমা শাস্ত্র যাই বলুক - তুমি -আমি -রূপা বাগদি, শ্যাম মুচি- আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা মানুষ। এর বাইরে আর সব মিথ্যে।

দুর্গাদেবী- অতসব আমি বুঝি না ভাই। তোমার বাপ ঠাকুরদা পৈতে নিয়েছেন তোমাকেও তা নিতে হবে।

ঈশ্বর- আমি বলি শোনো ঠাকুরমা। এসব পৈতে টৈতে হল জাতের চিহ্ন স্বরূপ। এছাড়া এর বেশি কিছুই না। যেমন ধর সমাজের কেউ সর্বাঙ্গে বড় বড় ফোঁটা তিলক কাটালে আমরা তার এই চিহ্ন দেখে বলি উনি বৈষ্ণব-ঠিক তেমনি আবার কারুর পরনে গেরুয়া কাপড় দেখে তাকে বলি সাধু, আবার কারোর হাতে লোটা কমন্ডলু ত্রিশূল আর মাথায় লম্বা জটা দেখলেই বলি সন্ন্যাসী, ঠিক তেমনি কারোর গলায় পৈতে দেখলেই বলি উনি ব্রাহ্মণ।

দুর্গাদেবী- তবু তো মানুষ এই চিহ্ন দেখে ওদের শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে-

ঈশ্বর- সাধারণ মানুষ না জেনে অন্ধভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি করে। তুমি জাননা ঠাকুরমা- এই সমাজের কত মানুষ যে ওইসব চিহ্ন পরেই কত সহস্র অন্যায় আর কুকাজ করে চলেছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে- তা জানলে তুমি শিউরে উঠতে। তাই তোমায় বলি ঠাকুরমা ওইসব চিহ্ন গুলির আজকের দিনে আর কোন প্রয়োজন নাই।

দুর্গাদেবী- ঈশ্বর! [গলা কেঁপে ওঠে]

ঈশ্বর- না ঠাকুরমা না। তোমার সহজ বিশ্বাসে আমি আঘাত করতে চাই না। যা সত্য তাই কেবল তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি। তাতে তুমি আঘাত পেয়ে থাকলে- আমাকে তুমি একটি বার ক্ষমা করে দাও ঠাকুরমা। [জড়িয়ে ধরে]

দুর্গাদেবী- দাদুভাই দাদুভাই। [কান্নায় ভেঙে পড়ে]

ঈশ্বর- তুমি দুঃখ করো না ঠাকুরমা। ঠিক আছে তোমার প্রস্তাব আমি ভেবে দেখব। আমাকে তুমি কিছুদিন সময় দাও। তুমি আমাকে ভুল

বোঝনা ঠাকুরমা। [ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখে]

দুর্গাদেবী- দাদুভাই আমরা কোন পড়াশুনা করিনি। যা শুনেছি বাপ ঠাকুরদার কাছ থেকে তাই সরল বিশ্বাসে মেনে চলেছি যুগ যুগ ধরে। এর ভালো কী, মন্দ কী তা নিয়ে কখনো যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করিনি আমরা। এই যে তুমি বললে বামন ঘরের ছেলেদের পড়তে হয় মেয়েদের হয় না তার কারণটাই বা কী - এ নিয়ম কে বা কারা তৈরি করেছে, এর উদ্দেশ্য কী ছিল, অতসব বুঝবার চেষ্টা করিনি, এসব নিয়ে কোন প্রশ্ন জাগেনি মনে।

ঈশ্বর- ঠাকুরমা-

দুর্গাদেবী- দাদুভাই আজকে তোমার মুখ থেকে এসব কথা যতই শুনছি ততই যেন মনের বদ্ধ আগলটা খুলে যাচ্ছে। অন্ধকার মনের গুহায় একটা অচেনা আলো ছড়িয়ে পড়ছে। তাই আমার মনে হচ্ছে-যতটা চিনি তোমাকে তার চেয়েও যে অনেক অচেনা তুমি ভাই। আমি আজ বুঝতে পেরেছি তুমি এই জগতের বুকে একটা নতুন আলো জ্বেলে দিতে এসেছো- আমার ভাগ্যবতী মা ভগবতীর কোল আলো করে। দাদুভাই-তুমি আমাদের চেনা-অচেনা ঈশ্বর, তুমিই আমাদের চেনা অচেনা ঈশ্বর।

[যবনিকা]

বিদ্যাসাগরের উইলের নকল

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পুর্ব্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় পসপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিনজনকে আমার অন্তিম 'বিনিয়োগপত্র কার্য্যদর্শী' নিযুক্ত করিলাম, তাঁহারা এই বিনিয়োগপত্র অনুযায়ী যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

৩। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক।

৪। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে কার্য্যদর্শীদিগের অবগতি নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগপত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

৫। কার্য্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্ব প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, এই সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন, আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

৭। এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিকবৃত্তি পাইয়া থাকেন আমি অবিদ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে।

প্রথম শ্রেণী

পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০ পঞ্চাশ টাকা
মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন	৪০ চল্লিশ টাকা
তৃতীয় সহোদর শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪০ চল্লিশ টাকা
কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০ ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী	১০ দশ টাকা
মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী	১০ দশ টাকা
কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী	১০ দশ টাকা
বনিতা শ্রীমতী দিনময়ী দেবী	৩০ ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী	১৫ পনর টাকা
মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী	১৫ পনর টাকা
তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী	১৫ পনর টাকা
কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী	১৫ পনর টাকা
পুত্রবধূ শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী	১৫ পনর টাকা

পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী	১৫ পনর টাকা
জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	১৫ পনর টাকা
কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীশচন্দ্র সমাজপতি	১৫ পনর টাকা
দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরাণী দেবী	১৫ পনর টাকা
কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী এলোকেশী দেবী	১০ দশ টাকা
শাশুড়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী	১০ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী	১০ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী	১০ দশ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী	৩ তিন টাকা
মাতৃদেবীর মাতুল-দৌহিত্র গোপালচন্দ্রের বনিতা	৩ তিন টাকা
পিতৃস্বসৃ পুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা	৩ তিন টাকা
পিতৃদেবের পিতৃস্বসৃ কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিনী দেবী	৩ তিন টাকা
বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী	৫ পাঁচ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা	৮ আট টাকা
মদনমোহন বসুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী	১০ দশ টাকা
শ্রীযুক্ত মধূসুদন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী	১০ দশ টাকা
বারাসত নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মিত্র	৩০ ত্রিশ টাকা
কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাহার বনিতা	
শ্রীমতী উমেশমোহিনী দাসী	১০ দশ টাকা
শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী	২ দুই টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণী

মাতৃস্বসৃ-পুত্র শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১০ দশ টাকা
ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী	৫পাঁচ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী	৫ পাঁচ টাকা
পিতৃস্বসৃ-কন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী	২ দুই টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃ-পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষাল	৫ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুল পুত্র তারাচরণ মুখোপাধ্যায়	৮ আট টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃ-পুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায়	৫ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর পিতৃস্বসৃ-পুত্র রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়	৫ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুল কন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী	২ দুই টাকা
বারাসত নিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা	
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী	১০ দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী বামাসুন্দরী দেবী	১০ দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী	৩ তিন টাকা
বর্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী	১০ দশ টাকা

৮। যদি কার্য্যদর্শীরা দ্বিতীয় শ্রেণী নিবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া

অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না পাইলেও তাঁহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহারা বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

৯। আমার দেহান্ত সময়ে আমার মধ্যমা তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক কোনও কারণে তাহাদের ভরণপোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাসিক ১৫ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১০। আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎসা রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১১। যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অতিরিক্ত মাসিক ২০ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোন পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অতিরিক্ত মাসিক ১০ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১৩। কার্য্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্য্যের বনিতা শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও পুত্রত্রয়ের ভরণপোষণার্থে মাস মাস ৩০ ত্রিশ টাকা আর তাঁহার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্ত্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভয় বিধেয় মধ্যে কোন প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।

১৪। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয় — ১০০ একশত টাকা
জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে স্থাপিত চিকিৎসালয় — ৫০ পঞ্চাশ টাকা
জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক —৩০ ত্রিশ টাকা
বিধবা বিবাহ — ১০০ একশত টাকা

১৫। যদি শ্রীযুক্ত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ভড় এই তিন জন আমার দেহান্ত সময় পর্য্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ তিনশত টাকা দিবেন।

১৬। কার্য্যদর্শীরা বিষয় রক্ষা লৌকিকতা রক্ষা কন্যা দান আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা অনুসারে করিবেন।

১৭। এই বিনিয়োগপত্রে যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিলাম যদি তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা অথবা সে বিষয়ের সুশৃঙ্খলা না হয় তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ

করিবেন তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যদি উত্তরকালে তাহার খর্ব্বতা হয় তাহা হইলে যাঁহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্ব্বন্ধ করিলাম কার্য্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভুচন্দ্রের (সংস্কৃত যন্ত্রের) পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার পুস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয়, তবে এক্ষণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২১। কার্য্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন, মতভেদস্থলে অধিকাংশের মতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

২২। নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের মধ্যে কেহ অবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে দুইজন তাঁহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় কার্য্যক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৩। যদি নিযুক্ত ব্যক্তি কার্য্যদর্শীরা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে যাঁহারা এই বিনিয়োগপত্র অনুসারে বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

২৪। যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিনিয়োগপত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ধারার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন, ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন।

২৫। আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি। এই হেতু বশতঃ বৃত্তি নির্ব্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগপত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল।

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোকাম কলিকাতা।

ইশাদী

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্যামাচরণ দে শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীনীলমাধব সেন শ্রীকালীচরণ ঘোষ
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযোগশেচন্দ্র দে

সর্ব্ব সাকিম কলিকাতা।

চতুর্থ ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি

(ক) সংস্কৃত যন্ত্রের তৃতীয় অংশ

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক

বাঙ্গালা

(১) বর্ণপরিচয় দুই ভাগ (২) কথামালা (৩) বোধোদয় (৪) চরিতাবলী (৫) আখ্যানমঞ্জুরী দুই ভাগ (৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (৭) জীবন-চরিত (৮) বেতালপঞ্চবিংশতি (৯) শকুন্তলা (১০) সীতার বনবাস (১১) ভ্রান্তিবিলাস (১২) মহাভারত (১৩) সংস্কৃত ভাষা প্রস্তাব (১৪) বিধবাবিবাহ বিচার (১৫) বহুবিবাহ প্রস্তাব সংস্কৃত

(১) উপক্রমণিকা (২) ব্যাকরণ কৌমুদী (৩) ঋজুপাঠ তিন ভাগ (৪) মেঘদূত (৫) শকুন্তলা (৬) উত্তরচরিত

ইংরেজী

(১) Political Selections

(২) Selections from Goldsmith

(গ) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।

(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

(ঘ) কাদম্বরী সটীক, বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পার্শী, ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরী। (চ) কর্ম্মাটারের বাঙ্গালা ও বাগান।

(স্বাক্ষর)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'ভ্রমনিরাশ' ১৩০২ সাল

(বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র জীবন অসহায় মানুষের সাহায্যার্থেই অতিবাহিত করেছেন। তাঁর সাহায্যের ক্ষেত্র এতই বিস্তৃত ছিল যে, বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের সাহায্য পেয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা গণনা করা কঠিন কাজ। তাঁর মৃত্যুর পরও এই কাজ যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে তিনি এই উইল রচনা করেন। উইলটি তাঁর বৃহৎ কর্মকান্ডের অতি অল্প অংশ পাঠকের সামনে উপস্থিত করে।)

বিদ্যাসাগরের রচনাপঞ্জী

রচিত ও সংকলিত:

১৮৪৭ - বেতাল পঞ্চবিংশতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত হিন্দি পুস্তক বৈতাল গ্রন্থের অনুবাদ।

১৮৪৮ - বাঙ্গালার ইতিহাস - দ্বিতীয় ভাগ মার্শম্যান রচিত ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহন থেকে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং এর অধিকার পর্যন্ত বিবৃত।

১৮৪৯ - জীবনচরিত, চেম্বার্স-সংগৃহিত ইংরেজি পুস্তক অনুসারে।

১৮৫১ - বোধোদয় (শিশুশিক্ষা ৪ র্থ ভাগ) Rudiments of Knowledge, Chambers এর ইংরেজী পুস্তক থেকে সংকলিত।

১৮৫১ - সংস্কৃত ব্যকরণের উপক্রমণিকা।

১৮৫১ - ঋজুপাঠ ১ম ভাগ, পঞ্চতন্ত্রের উপাখ্যান ও মহাভারতের কিছু অংশের গল্প। নাগরী হরফে ছাপা। বাংলা ভূমিকা।

১৮৫১ -ঋজুপাঠ ৩য় ভাগ, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার গ্রন্থগুলি থেকে সংগৃহীত

১৮৫২ - ঋজুপাঠ ২য় ভাগ, রামায়ণের অযোধ্যা কান্ড অংশবিশেষ সংকলিত।

১৮৫৩ - সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রস্তাব। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এই প্রস্তাব কলিকাতাস্থ ব্রিটেনের সোসাইটি নামক সমাজে প্রথম পালিত হয়।

১৮৫৩ - ব্যাকরণ কৌমুদী প্রথম ভাগ।

১৮৫৩ - ব্যাকরণ কৌমুদী দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৫৪ - ব্যাকরণ কৌমুদী তৃতীয় ভাগ। ব্যাকরণ কৌমুদী চতুর্থ ভাগ।

১৮৫৪- শকুন্তলা, মহাকবি কালিদাস 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম' নাটকের উপাখ্যানভাগ।

১৮৫৫ - বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

১৮৫৫ - বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ।

১৮৫৫ - বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৫৫ - বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক। বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিবাদকারীদের প্রতি উত্তর। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত পুস্তক দুখানি Marriage of Hindu

Widows নামে ইংরেজিতে অনুদিত ও প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ - কথামালা। Aesops Fables পুস্তকের নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের অনুবাদ।

১৮৫৭ -চরিতাবলী, ডুবাল, রস্কো প্রভৃতি কতকগুলি মহানুভব এর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত।

১৮৬০ -মহাভারত (উপক্রমণিকা ভাগ) ১৮৬০ - সীতার বনবাস। ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত ও রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অবলম্বনে সংকলিত।

১৮৬৩ - আখ্যানমঞ্জরী। কতিপয় ইংরেজি পুস্তক অবলম্বন পূর্বক সংকলিত।

১৮৬৪ - শব্দমঞ্জরী । বাংলা অভিধান 'অ' থেকে 'নিবৃত্তি' পর্যন্ত।

১৮৬৯ - ভ্রান্তিবিলাস। শেক্সপিয়ারের "Comedy of Errors" অবলম্বনে রচিত।

১৮৭১ - বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। বহুবিবাহ প্রথা বিরুদ্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

১৮৭৩ - বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক বহুবিবাহ সমর্থনকারীদের মত।

১৮৭৩- বামনাখ্যানম্। মধুসূদন তর্কালঙ্কার-রচিত ১১৭টি শ্লোকের বিদ্যাসাগর কৃত বাংলা অনুবাদ।

১৮৮৫ - নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস। মদনমোহন তর্কালঙ্কার-রচিত শিশুশিক্ষা ১ ম, ৩ য় ভাগের অধিকার সম্পর্কিত অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য রচিত।

১৮৮৯ - সংস্কৃত রচনা। বাল্যকালে রচিত কতকগুলি সংস্কৃত রচনা।

১৮৯০ - শ্লোকমঞ্জরী। কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ।

১৮৯১- বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)। বিদ্যাসগর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন পিতার মৃত্যুর পর এই আত্মজীবনচরিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ ও তার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি বিবৃত আছে।

সম্পাদিত

১৮৫২ - বৈতালপচ্চীসী (হিন্দি) ।ইংরেজী ভূমিকা সহ হিন্দী বেতালপঞ্চবিংশতি।

১৮৫৩-৫৮ - সর্ব্বদর্শন সংগ্রহঃ এই গ্রন্থ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। ভূমিকাটি ইংরেজীতে লিখিত।

১৮৫৩ - রঘুবংশম্ ।

১৮৫৩ - কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ ।

১৮৫৭ - শিশুপালবধ।

১৮৬১ - কুমারসম্ভব। মল্লিনাথু কৃতটীকা সহ। বাংলা ভূমিকা।

১৮৬২ - কাদম্বরী। আখ্যানপত্রে বিদ্যাসগরের নাম নেই। বাল্মীকিরামায়ণু সঠিক বিদ্যাসাগরের উইলে এই পুস্তকের উল্লেখ আছে।

১৮৬৯ - মেঘদূতম্। মল্লিনাথ-কৃতটীকা সহ। বাংলা ভূমিকা।

১৮৭০ - উত্তরচরিতম্।

১৮৭১ - অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

১৮৮৩ - হর্ষচরিতম্।

১৮৪৭ - অন্নদামঙ্গল ১ম ও ২য় খন্ড। কৃষ্ণনগরের রাজবাটী মূল পুস্তক অবলম্বনে পরিশোধিত।

১৮৮৮ - পদ্যসংগ্রহ। কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণ থেকে সংকলিত।

১৯৮০ - পদ্যসংগ্রহ ২য় ভাগ। মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত অন্নদামঙ্গল থেকে সংকলিত। Selection from the Writings of Goldsmith Selections from English Literature Poetical Selections.

বেনামী রচনা

১৮৭৩ - অতি অল্প হইল। কস্যাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত। বহু বিবাহের সপক্ষে তর্কবাচস্পতি যা লেখেন তার প্রত্যুত্তর।

১৮৮৪ - ব্রজবিলাস-যৎকিঞ্চিত অপূর্ব মহাকাব্য-কবি কুলতিলক কস্যাচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত।

১৮৮৪ - বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা কস্যচিৎ তত্ত্বান্বষিণঃ। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে এই পুস্তিকার নামকরণ হয়েছে বিনয় পত্রিকা।

১৮৮৬- রত্নপরীক্ষা অর্থাৎ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন এই তিন পণ্ডিতরত্নের প্রকৃত পরিচয় প্রদান। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসচরস্য প্রণীত। বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনকারীদের সমালোচনা।

বিদ্যাসাগর রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ:

১৮৫০ - বল্যবিবাহের দোষ। সর্বশুভকরি ১ম সংখ্যা।

১৮৫১ - নীতিবোধ।

১৮৯২ -প্রভাবতী সম্ভাষণ। ‘সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সখা-ছোটদের পত্রিকা। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯৩ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ‘মাতৃভক্তি’ (জর্জ ওয়াশিংটনের কথা) ও ১৮৯৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ‘ছাগলের বুদ্ধি’ প্রকাশিত হয়। শব্দ সংগ্রহ - বাংলা প্রাদেশিক শব্দসংগ্রহ। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। ১৩০৮ সন, ২য় সংখ্যা, পৃঃ- ৭৪-১৩০, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৮২০ ২৬ সেপ্টেম্বর বীরসিংহ গ্রামে জন্ম।

১৮২৫ গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শুরু।

১৮২৯ ১ জুন কলকাতার কলেজে প্রবেশ, মাত্র ৯ বছর বয়সে।

১৮৪১ ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের পাঠ সমাপ্ত। ২৯ ডিসেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত। বয়স ২১ বছর।

১৮৪৬ সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী।

১৮৪৭ সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী প্রতিষ্ঠা।

১৮৪৯ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেডরাইটার ও কোষাধ্যক্ষ। বয়স ২৯ বছর।

১৮৫০ সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বেথুন গার্লস স্কুলের সম্পাদক।

১৮৫১ সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক এবং কয়েকদিন পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ।

১৮৫৩-৫৪ বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক স্কুল,নাইট স্কুল, রাখাল বালকদের জন্য স্কুল, মেয়েদের স্কুল এবং মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন।

১৮৫৫ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ ছাড়াও দক্ষিণ বাংলা স্কুল ইন্সপেক্টর পদ গ্রহণ, বিভিন্ন জেলায় স্কুল প্রতিষ্ঠা, বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রোধের জন্য সরকারের নিকট আবেদন। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে ভারত সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠন এবং তার অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত।

১৮৫৬ জানুয়ারির মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের ৪ জেলায় ২০০টি মডেল স্কুল স্থাপন। ১৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ। ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান।

১৮৫৭ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের প্রথম মিটিংয়ে আর্টস ফ্যাকাল্টির সদস্য হিসাবে মনোনীত। বিশ্ববিদ্যালয়য়ের সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এবং ওড়িয়া ভাষার পরীক্ষক হিসাবে নিযুক্ত।

১৮৫৭-৫৮ বিভিন্ন জেলায় ৫৬টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন (হুগলিতে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি ও নদীয়ায় ১টি)। ৩ নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ।

১৮৬৬ মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের পরিচালনভার গ্রহণ।

১৮৭৩ মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন।

১৮৯০ বীরসিংহে 'ভগবতী বিদ্যালয়' স্থাপন।

১৮৯১ ২৯ জুলাই ৭১ বছর বয়সে প্রয়াণ।

পরিবারের প্রয়াতদের স্মৃতিতে দান করেছেন যাঁরা

নারায়ণ চন্দ্র বেরা
সুবল চন্দ্র বেরা
কার্ত্তিক চন্দ্র বেরা
লক্ষ্মণ চন্দ্র বেরা
সৌমিত্র বেরা
সুনীতা বেরা
রথীন বিশ্বাস
গৌরাঙ্গ গাঁতাইৎ
বলাই চন্দ্র ঘোড়াই
গুরুপদ গাঁতাইৎ
বরেন্দ্রনাথ গাঁতাইৎ
শ্যামাপদ গাঁতাইৎ
বলরাম রায়
রাধেশ্যাম গাঁতাইৎ
মাধব চন্দ্র গাঁতাইৎ
সোমনাথ সোমা
অসীম, অমিত
সায়নদ্বীপ, অয়নদ্বীপ
দুর্গাপদ বেরা
কিশোরী জানা
মধুসূদন জানা
শচীন্দ্রনাথ জানা
অনন্ত কুমার শীট
কমল কৃষ্ণ পাল
মাধব চন্দ্র পাল
গোলকেশ মহাপাত্র
কমলা জানা

প্রয়াত ব্যোমকেশ দাস-এর পুত্রগণ
পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ
সুকান্ত ভঞ্জ
কমলাকান্ত ভঞ্জ
বিনয় কুমার বেরা
সুজাতা বেরা
সৌমিতা বেরা
লুসী সামন্ত
জ্যোতির্ময় সামন্ত
গৌরাঙ্গ সাহু
নিতাই সাহু
নন্দন বেরা
বিকাশ বেরা
শম্ভুনাথ গিরি
প্রসাদ চন্দ্র গিরি
শচীন্দ্রনাথ মন্ডল
শংকর মন্ডল
মনতোষ মন্ডল
সীতা রাণী মন্ডল
অজিত কুমার মন্ডল
ভাগবত কুইল্যা
বাদল কুইল্যা
কার্ত্তিক কুইল্যা
সূর্যকান্ত হাতী
সুশান্ত হাতী
অশোক কুমার দাস অধিকারী

হিমাংশু শেখর দাস
শিবানী দাস
সৌমেন দাস
রমেন দাস
শৈলেন দাস
গৌতম গাঁতাইৎ
শংকর প্রসাদ হাজরা
কালিপদ সিমলাই
অসিত বরণ সিমলাই
সত্য প্রসাদ মহাপাত্র
প্রয়াত প্রফুল্ল জানার কন্যা ও পুত্রগণ
কানাইলাল মাইতি
লক্ষীকান্ত মাইতি
নিয়তি মাইতি
শচীন্দ্রনাথ দাস
নিশীথ দাস
শংকর রানা
নারায়ণ গিরি
দুলাল গিরি
বিশ্বনাথ দাস
মিলন কুমার শুকাই
নারায়ণ চন্দ্র কুইল্যা
কৃষ্ণা রানী কুইল্যা
কালিপদ ঘোড়াই
পূর্ণচন্দ্র ঘোড়াই

দুর্ভিক্ষে কম্বল দান করছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কার্মাটারে সাঁওতালদের ভুট্টা দান করছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

“অনুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থ-বিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবা মাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবল পর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।”

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

মূল্য ঃ ১২০টাকা

হরফ ...একটি ছাপাখানা